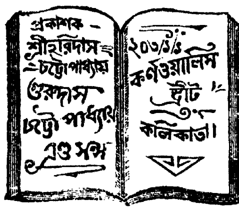
আট-আনা সংস্করণ-গ্রন্থমালার পঞ্চাশীতিতম গ্রন্থ

মোহিনী

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

ফাল্গুন—১৩২৯



প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উপহার

কৈফিয়ত

আজকালকার দিনে যেমন এক দিকে আবালবৃদ্ধবনিতা গল্প পড়িবার জন্য লালায়িত, তেমনি অন্য দিকে নবীন-প্রবীণ-স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে গল্প লিখিতে প্রবৃত্ত। অন্যে পরে কা কথা, দর্শনশাস্ত্র ও ব্যবহারশাস্ত্রের মত গুরুগম্ভীর বিষয়ের অধ্যাপকও গল্পের পসরা লইয়া সাহিত্যের হাটে ফিরি করিতেছেন। ইহা যুগধর্ম্ম, এড়ান অসাধ্য, অসম্ভব বলিলেও হয়। এ অবস্থায়, বর্ত্তমান লেখকের যখন সুকুমার সাহিত্যের পঠন-পাঠন লইয়াই কার-কারবার, তখন তাঁহার পক্ষে এই পথের পথিক হওয়ায় বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, সাহিত্য-সৌধের অন্য দুই একটি প্রকোষ্ঠে তাঁহার অল্পবিস্তর প্রবেশাধিকার থাকিলেও, এই প্রকোষ্ঠে তাঁহার নিতান্তই অনধিকার-প্রবেশ। কালের ধর্ম্ম বশেই ইহা ঘটিয়াছে, লেখকের এইমাত্র সাফাই।

এই ক্ষুদ্রকায় পুস্তকে প্রকাশিত আটটি গল্পের মধ্যে দুইটি বিদেশী গল্প বা কিংবদন্তীর ভিত্তির উপর গঠিত; একটি অন্যের মুখে শ্রুত আখ্যানের অনুবৃত্তি, দুইটি সত্য-ঘটনামূলক, অবশিষ্ট তিনটি লেখকের নিজস্ব কল্পনা-প্রসূত। নিরবলম্বে গল্প লেখা এই অক্ষম লেখকের শক্তিতে কুলায় না, এবংবিধ স্বীকারোক্তি

অনেকদিন পূর্ব্বে 'বিষবৃক্ষের উপবৃক্ষে'র উপলক্ষে করিয়াছিলাম। 'দাদামশায়' গল্প লিখিতে গিয়াও অর্দ্ধপথে থামিয়া গিয়াছিলাম। গত কয়েক বৎসরে লেখকের এই পথে কতটুকু উন্নতি হইয়াছে, 'মোহিনী' তাহার পরিচয় দিবে। এসম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্য-মাত্র। গল্পগুলির হাস্যরসে আরম্ভ হইয়া করুণরসে অবসান হইয়াছে—তাহার কারণ 'পাগলা ঝোরা'র ভূমিকায় একবার বলিয়াছি। পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। ইত্যলমতি-বিস্তরেণ।

১লা ফাল্গুন ১৩২৯ গ্রন্থকার

সূচি

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

প্রেমের কথা (আট আনা সংস্করণ)	...	॥০
ফোয়ারা (৩য় সংস্করণ, পরিবর্দ্ধিত)	...	১।০
পাগলা ঝোরা (২য় সংস্করণ, „)	...	২৲
কপাল-কুণ্ডলা-তত্ত্ব (২য় সংস্করণ, „)		॥০
কাব্যসুধা (ননদ-ভাজ ইত্যাদি)	....	১৲
সখী	... ...	॥০
অনুপ্রাস	... ...	॥০
ককারের অহঙ্কার	...	।৴০
ব্যাকরণ-বিভীষিকা (২য় সংস্করণ)	...	।৵০
বানান-সমস্যা (২য় সংস্করণ)	...	।০
সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা	...	৵০

ছেলেমেয়েদের জন্য—

ছড়া ও গল্প (৫ম সংস্করণ)	...	॥০
আহ্লাদে আটখানা (৩য় সংস্করণ)	...	॥০
রসকরা	...	॥০
সাত নদী (৮খানি তিন-রঙের ছবি আছে)	...	॥৵০

মোহিনী

মোহিনী

মোহনের ডায়েরি

১লা জানুয়ারী। আজ ছুটির দিন, ইডেন্ গার্ডেনে বেড়াইব বলিয়া বেলা থাকিতেই বাহির হইয়া পড়িলাম। বৌবাজার ষ্ট্রীট দিয়া যাইতেছি এমন সময়, দোতালার জানালা হইতে কে যেন ডাকিল, 'মোহন দা'। মুখ তুলিয়া দেখি 'মোহিনী'। সে উপরে যাইতে ইসারা করিল। উপরে উঠিবামাত্র হাসিমুখে দুয়ার পর্য্যন্ত আসিয়া আমাকে দুই হাত বাড়াইয়া ধরিল, ধরিয়া এমন নিবিড় আলিঙ্গন করিল যে, প্রিয়তমাও কখনও তেমন করেন নাই। (কথাটা শুনিলে শ্রীমতী হয়ত 'দুর্জ্জয় মান' করিয়া বসিবেন !) কত কাল পরে দেখা। কাছে

বসাইয়া সে কত সুখ-দুঃখের কথা বলিল; আমিও নীরব রহিলাম না। ছেলেবেলাকার ভাব, সেই বাগানে বাগানে আম, জাম, লিচু, গোলাপজাম, জামরুল, পেয়ারা, ফল্‌সা, কুল পাড়িয়া খাওয়া আর পাখীর ছানা চুরি করা। সমবয়সীরা 'মোহন' আর 'মোহিনী' বলিয়া কত ছেপলামি ঠাট্টা করিয়াছে। তখন সেজন্য কত রাগ করিয়াছি, দু'জনেই কত লজ্জা পাইয়াছি। এখন সে সব মনে করিলে হাসি পায়। এমনি সব আলাপে কতক্ষণ কাটিল। সে কি আর ছাড়িতে চাহে? রাত হইয়া গেল। 'শীঘ্রই আর একদিন আসিব' বলিয়া বিদায় লইলাম। বিদায়কালেও আবার সেই নিবিড় আলিঙ্গন। প্রভেদের মধ্যে কেবল হাসিমুখের বদলে বিষণ্ণ মুখ। আহা, মোহিনী যে চিরদিনই কোমলপ্রকৃতি! বাল্যের ভালবাসার মধুর স্মৃতি লইয়া ঘরে ফিরিলাম।

২রা। ছুটীর পর বাঁধাধরা কায আরম্ভ। কিছুই লিখিবার নাই। মোহিনীর কথা থাকিয়া থাকিয়া মনে পড়িতেছে। আর কত স্মৃতি উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। হায় রে! সে সুখের দিন!

৩রা। আজ হিষ্ট্রীর প্রোফেসার আসেন নাই,

এক ঘণ্টা আগে ছুটি পাওয়া গেল। ভাবিলাম, মোহিনীর ওখানে বেড়াইয়া আসি। অনেক দিন দেখি নাই, স্মৃতি প্রায় মুছিয়া গিয়াছিল। এখন নূতন করিয়া আবার সব কথা মনে পড়িয়া প্রাণটা আকুল করিয়া তুলিয়াছে। তাই মোহিনীকে অনেক কাল পরে দেখিয়া বার বার দেখিতে ইচ্ছা হয়। বাল্যের ভালবাসা—সহজে ভোলা যায় না। তাহারও কত আনন্দ, কত আগ্রহ—এক পা দু'পা করিয়া তাহার ওখানে গেলাম। বড় আরামে এক ঘণ্টা কাটাইয়া আসিলাম। হায়! আর সে সুখের ছেলেবেলা ফিরিয়া আসে না?

৪ঠা। আহারের পর কলেজ, কলেজের পর ঘরে ফেরা। বৈকালে বন্ধুদের পাল্লায় পড়িয়া ফুটবল ম্যাচ দেখিতে যাওয়া। রাত্রে পড়াশুনার পর শয়ন। স্বপ্নে মোহিনীর সঙ্গে গ্রামের পুকুরে সাঁতার দিতেছি—মোহিনী বড় ভীতু, বেশী দূর আগাইতে চাহিতেছে না, ইত্যাদি।

৫ই। আজ প্রাতে শীতটা বেশী বেশী বোধ হইতেছে। (কা'ল রাত্রে স্বপ্নে পুকুরে সাঁতার কাটার জন্য নহে ত ?) উঠিতে বেলা হইল। এই শীতের ভোরে তখনকার দিনে নাগরী হইতে খেজুর-রস ঢালিয়া খাওয়ার কথা, মোহিনীর

গলায় রস ঢালিয়া দেওয়ার কথা মনে পড়িল। মোহিনী শীতে জবুথবু হইয়া পড়িত, ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে খেজুর-রস খাইতে চাহিত না। রস তাহার বুকের কাপড় বহিয়া পড়িত, তাই লইয়া কত হাসাহাসি চলিত। যাক্, আর সে পুরাণ কথা লইয়া তোলাপাড়া করিব না। প্রাতে উঠিয়া পড়াশুনা, আহারান্তে কলেজে যাওয়া ইত্যাদি।

৬ই। আজ শনিবার। কলেজ হইতে ফিরিয়া মোহিনীর একখানি ছোট্ট চিঠি পাইলাম। তাহার ওখানে রাত্রে আহারের নিমন্ত্রণ। যাই, বাহির হইয়া পড়ি। আবার কোন্ বন্ধু আসিয়া পড়িবে, যাইতে বিলম্ব ঘটিবে। হয় ত বন্ধু থিয়েটার কি বায়োস্কোপ দেখিবার, কি এই রকম একটা না একটা সৃষ্টিছাড়া আব্দার করিয়া বসিবে।

ডায়েরির বিপদ্

মোহনচন্দ্র ছোটখাট জমিদার; 'যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ প্রভুত্বম্' তিনই তাঁহার ছিল, কিন্তু 'অবিবেকিতা' ছিল না, সুতরাং বহিয়া বা বকিয়া যান নাই, গ্রামের স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পাশ করিয়া কলিকাতায়

কলেজে পড়িতে আসেন, এখন বি এ পড়িতেছেন। একটু বেশী বয়সেই পাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আবার জমিদার, অতএব বিবাহটা কলেজে পড়া আরম্ভ করার সমকালেই হইয়াছিল; এবারকার পূজার ছুটির পর প্রারব্ধযৌবনা পত্নী হরিদাসীকে কলিকাতার বাসায় আনিয়াছেন—অবশ্য অভিভাবিকা কেহ নাই। শ্যাম-বাজারে হরিদাসীর দিদি কৃষ্ণদাসী স্বামিগৃহে থাকেন—আপদে বিপদে তাঁহাদেরই ভরসা। হরিদাসী পাড়া-গাঁয়ের মেয়ে, অল্পস্বল্প লেখাপড়া জানে, নভেল-নাটক পড়িতে পারে, তবে স্বামীর অগাধ (?) বিদ্যার লাগাল ধরিতে পারে না। স্বামী একখানি সুন্দর বাঁধান খাতায় চুপি চুপি কি লেখেন (কবিতা নহে ত ?) আবার ডেস্কে বন্ধ করিয়া রাখেন, বড় জানিতে ইচ্ছা করে; কিন্তু এখনও প্রগল্‌ভা হইয়া পড়ে নাই, মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারে না। আজ মোহনচন্দ্র মোহিনীর সহিত মিলিত হইবার জন্য তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িবার সময় ডায়েরি ও মোহিনীর চিঠিখানি ডেস্কের উপর ফেলিয়া রাখিয়াছেন, বন্ধ করিয়া রাখিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। বৈকালে চুল বাঁধিয়া গা ধুইয়া কাপড়

কাচিয়া সান্ধ্য সাজে সাজিয়া—হরিদাসী স্বামীর পড়ার ঘরে গিয়া এটা সেটা নাড়িতে নাড়িতে দেখিল, সেই সুন্দর খাতাখানি ডেস্কের উপর পড়িয়া আছে। কাছে গিয়া দেখিল, একখানি ছোট্ট চিঠিও তাহার পাশে রহিয়াছে। সে তাহার বড় লোভের জিনিস খাতাখানির খোলা পাতা দুইটি পড়িল আর চিঠিখানিও পড়িল। চিঠিতে এইরূপ লেখা—

—নং বৌবাজার ষ্ট্রীট্

শনিবার।

"মোহন দা, আজ দু'দিন আসনি। বড় মন কেমন করে। আজ সন্ধ্যেবেলা অবিশ্যি ক'রে এসো। এইখানেই খা'বে। 'বাবু' আজ ঘরে নেই, দেশে গেছেন। খুব ফূর্ত্তি হ'বে। বৌদিদির হাতের লুচি-ছক্কা খাওয়া হ'বে না ব'লে হয়ত দুঃখিত হ'বে, তিনিও হয়ত রাগ করবেন। কিন্তু বৌদি আজ দু'দিন তোমাকে দখল করেছেন, আমার দখল অনেক দিনের। সে দিন আবার পাট্টা নতুন ক'রে নিয়েছি। মোহ্দা, তিনি আর এখন ষোল আনার মালিক নহেন, আট আনা না হোক্ দু'আনা, নিদেন এক পাই দখল আমার থাকবেই। আমি যে তোমার সেই ছেলেবেলার

মোহিনী।"

ছোট্ট চিঠি, আঁখরগুলি মুক্তোর মত সাজান। হরিদাসী এমন লিখিতে পারে না। ডায়েরির পাতা দুইটি মোহিনীর কথায় ভরা। চিঠি ও ডায়েরি পড়িয়া তাহার মনের অবস্থা কি হইল, তাহা সহজেই অনুমেয়। অনেকক্ষণ দম ধরিয়া থাকিয়া খানিকটা সামলাইয়া সে মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতে লাগিল,—"উঃ! ছুঁড়ীটা কি বেহায়া, কি ব্যাপিকা, কি বদ্‌চরিত্রা, স্বামী একদিন ঘরে নেই আর পুরোনো পীরিতের লোককে ডেকেছে! আবার 'দাদা' বলাটুকুও আছে! আর এঁরই বা কি প্রিবিত্তি! এমন যদি, তবে আমাকে বিয়ে করাই বা কেন, আর ভালবাসা দেখিয়ে কাছে রাখাই বা কেন? ওঃ ভুলে যাচ্ছি, তখনও যে গুণের মোহিনী যোটে নি। তাই এ ক'দিন দেখি—কেমন যেন অন্যমনস্ক, সর্ব্বদাই মনটা ভার ভার। মাগো, আমার কপালে এতও ছিল!" এইরূপ মর্ম্মান্তিক কষ্টে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে আরও খানিকক্ষণ গুম হইয়া থাকিল। সহুরে মেয়ে নহে, তাই হিষ্টিরিয়া চাগিল না। তা'র পর ভাবিল, 'আর না, এ জ্বালায় জ্বলার চেয়ে কেরোসিনের আগুনে পুড়ে চিরজীবনের জন্যে জ্বালা জুড়ুই, তিনিও নিষ্কণ্টক হ'ন।' এই সঙ্কল্প

করিল বটে, কিন্তু তাহাতেও মনটা বেশ হাল্কা হইল না। বরং এই প্রথম-যৌবনে অতৃপ্ত বাসনা লইয়া প্রিয়জনকে ছাড়িয়া যাইবার কথা ভাবিয়া তাহার বুক ভাঙ্গিয়া পড়িল। ফুলশয্যার রাত্রি হইতে স্বামীর যে সোহাগ-আদর পাইয়া আসিতেছে সে সব কথা মনে পড়াতে তাহার হৃদয় ভারাক্রান্ত হইল। অবশেষে তাহার চক্ষুঃ ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বিপদভঞ্জন মধুসূদন

কতক্ষণ ধরিয়া সে এই ঘরটিতে বসিয়া অঝোর-নয়নে কাঁদিতেছিল, তাহা সে জানে না। শেষে তাহার ভগিনীপতি মধুসূদন বাবু যখন সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া অশ্রুমুখী শ্যালিকাকে দেখিয়া 'এ কি!' বলিয়া উঠিলেন, তখন তাহার হোর হইল। তাঁহাকে দেখিয়া তাহার চোখের জল আরও শতধারে ছুটিল। ইনি একজন পুলিশ-কর্ম্মচারী, সুতরাং রাশভারী লোক। হরিদাসীর দিদি কৃষ্ণদাসীকে কখন চটুল প্রেমালাপে পরিতৃপ্ত করেন না, সেজন্য দিদি কত দুঃখ করিয়াছে, আর হরিদাসী দিদির অবস্থার সহিত নিজের স্বামিসৌভাগ্যের কথা মনে

মনে তুলনা করিয়া কত সুখ, কত গর্ব্ব অনুভব করিয়াছে—আজ সে সুখ, সে গর্ব্ব ধূলিসাৎ হইয়াছে, সে মোহন-স্বপ্ন টুটিয়াছে। ভগিনীপতির পুনঃ পুনঃ প্রশ্নের উত্তরে সে একটি কথাও বলিতে পারিল না, কেবল ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। শেষে ডায়েরির খোলা পাতা ও খোলা চিঠি তাঁহার নজরে পড়াতে তিনি সেগুলি পড়িয়া শ্যালিকার মনোবেদনার কারণ বুঝিতে পারিলেন। তিনি গম্ভীর-প্রকৃতি, কতকগুলা বাজে বক্‌নি বকিয়া সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলেন না। শুধু বলিলেন, "এর জন্যে ভাবনা কি? আমরা পুলিশের লোক, চোরকে এখনি বমাল-সমেত গ্রেপ্তার করব। তুমি ঠিক হ'য়ে থাক, আমি গাড়ী ডাকতে যাচ্ছি।"

মিনিট দশেক পরে তিনি গাড়ী লইয়া আসিলেন; হরিদাসী ঝীকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার অনুরোধে মন্ত্রচালিতের ন্যায় গাড়ীতে উঠিল। দরওয়ান বাসার উপর নজর রাখিতে বলিয়া মধুসূদন বাবু কোচওয়ানকে বৌবাজার ষ্ট্রীটের দিকে গাড়ী চালাইতে হুকুম দিলেন।

যথাসময়ে গাড়ী বৌবাজার ষ্ট্রীটের———নং বাড়ীতে আসিয়া লাগিল। মধুসূদন বাবু দেখিলেন, বাড়ীর দরজা খোলা, দরজায় কেহ নাই। তিনি হরিদাসী ও ঝীকে

গাড়ীতে রাখিয়া কোনওরূপ সাড়া না দিয়া বরাবর উপরে উঠিয়া গেলেন। গৃহস্থ-বাড়ীতে নীচে হইতে 'ঝী, ঝী' বা হাল-ফ্যাশানে 'বেয়ারা, বেয়ারা' বলিয়া চীৎকার করিতে হয়, অথবা 'কে আছেন বাড়ীতে' বলিয়া টেক্স-দারোগার মত 'আকাশে' প্রশ্ন করিতে হয়, সভ্যতার এসব নিয়ম-কানুন জানিলেও, এক্ষেত্রে তিনি একটু ডিটেক্‌টিভ্-গিরির লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না।

উপরে উঠিয়াই তিনি যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে তিনি হাসিবেন কি কাঁদিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না; তিনি দেখিলেন, মেসের বাড়ীর একটি অপরিষ্কার ঘরে দুইখান কেওরা-কাঠের তক্তাপোষ যুড়িয়া একখানি তেলচিটে শতরঞ্চ পাতা, তাহার উপর বসিয়া মোহনচন্দ্র ও আর তিনটি যুবক তাস পিটিতেছে, প্রত্যেকের পাশে একজন করিয়া তন্ত্রধারক; কেহ বিড়ি, কেহ সিগ্‌রেট্ টানিতেছে, কেহ বা নস্য লইতেছে, আবার কেহ বা ডাবা হুকায় তামাক খাইতেছে; আর এক দিকে বাঁয়া, তবলা, বেহালা, ফ্লুট্, হারমোনিয়াম্ প্রভৃতি রহিয়াছে, বোধ হয় দুই এক বাজি উঠিলেই সঙ্গীতচর্চ্চা আরম্ভ হইবে, অথবা

সঙ্গীত-সুধা-পানের পর যুবকগণ খেলায় মাতিয়াছে। ইহার ভিতর 'মোহিনী' কোথায়, তিনি কিছুই ঠাহর করিতে পারিলেন না। এই সময়ে মোহনচন্দ্র হঠাৎ মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে মধুসূদন বাবু। তিনি কি প্রয়োজনে এখানে উপস্থিত, ঠিকানাই বা জানিলেন কি প্রকারে, মোহনচন্দ্র ইহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে না পারিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন। মেসের সকলেও এই অপরিচিত ব্যক্তির অতর্কিত আগমনে অবাক্।

যাহা হউক মধুসূদন বাবু পুলিশের লোক, সহজে দমিবার পাত্র নহেন। কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া তিনি হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মোহন ভায়া, ইহার মধ্যে তোমার মোহিনী কে?" মোহন এই প্রশ্নে একটু বিস্মিত হইয়া পার্শ্বোপবিষ্ট তন্ত্রধারককে দেখাইয়া দিলেন। মধুসূদন বাবু অপরিচিতকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ম'শায়, 'মোহিনী বাবু' বলিনি সেজন্যে মাফ করবেন। আপনি বোধ হয় 'বাবু' নন, 'বাবু' আপনাদের মধ্যে কেউ আছেন কি?" মোহিনী ভালমানুষ, একথায় অপমান-বোধ না করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "আজ্ঞে, ঠিকই বলেছেন, আমরা সব ভাই ভাই, আমাদের মধ্যে

বাবু টাবু কেউ নেই,—আমাদের মেসের ম্যানেজার বাবুকেই কেবল আমরা ঐ নামে ডাকি। তিনি রাশভারী লোক, 'বাবু' না বললে রাগ করেন। কিছু মনে করবেন না, তিনি আজ গরহাজির ব'লেই আমরা আজ এত স্ফূর্ত্তিতে আছি যে, আপনার আসা লক্ষ্য করিনি।"

মধুসূদন বাবু এখন ব্যাপারটা বুঝিলেন। তিনি মোহিনীর সহিত আর উত্তর-প্রত্যুত্তর না করিয়া মোহনচন্দ্রকে বলিলেন, "ভায়া, আমার সঙ্গে একটু যেতে হ'বে—বড় জরুরী কায। এখনকার মত তোমার বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে উঠে পড়।" মোহনচন্দ্র এই জরুরী তলব ঝাড়িয়া ফেলা অসম্ভব বুঝিয়া শুষ্কমুখে চিন্তাকুল-মনে বাল্যবন্ধু মোহিনী ও অপর সকলকে মধুসূদন বাবুর সংক্ষেপে পরিচয় দিয়া তাঁহাদিগের কাছ হইতে বিদায় লইলেন। মধুসূদন বাবু নীচে আসিয়া মোহনচন্দ্রকে গাড়ীর দরজা খুলিয়া যে দৃশ্য দেখাইলেন, তাহাতে মোহনচন্দ্র একেবারে চমকাইয়া উঠিলেন।

পাছে হরিদাসী উল্টা বুঝিয়া বসে, এই আশঙ্কায় মধুসূদন বাবু সময়োচিত পরিহাস করিয়া অনুচ্চস্বরে বলিলেন, "ওগো মানময়ি রাধে, এই নাও তোমার পলাতক আসামী। মোহিনী তোমার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিনী

চন্দ্রাবলী নয়, একজন গোঁফদাড়ীওয়ালা পুরুষ-মানুষ। বিশ্বাস না হয়, চল ওপরে গিয়ে সরেজমিনে তদারক করবে এস।” হরিদাসী এই কথা শুনিয়া লজ্জায় অধোবদন হইল। যে গম্ভীর-প্রকৃতি ‘বড় জামাই বাবু’ তাহার দিদির সঙ্গেও কোন দিন রসিকতা করেন না, তিনি তাহাকে লইয়া এমন ফষ্টিনষ্টি করিলেন, ইহাতে তাহার বড় লজ্জা হইল। তাহার উপর স্বামীকে অন্যায় সন্দেহ করাতে তাহার লজ্জা আরও দশগুণ বৃদ্ধি পাইল। অনুতাপে তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল। মোহনচন্দ্র এতক্ষণে ব্যাপারটা একপ্রকার বুঝিলেন, যেটুকু বাকী ছিল—মধুসূদন বাবু ডায়েরি ও চিঠির প্রসঙ্গ তুলিয়া দু’ কথায় তাহা বুঝাইয়া দিলেন। মোহন পত্নীর অবস্থা ভাবিয়া অপ্রস্তুত হইলেন; সুতরাং উভয়েই নীরব, আড়ষ্ট—হেঁটমুখ।

এসময়ে একজন তৃতীয় পক্ষের অবস্থান প্রেমিক-যুগলের মহাবিঘ্ন, ইহা বুঝিয়া উপস্থিত-বুদ্ধি মধুসূদন বাবু “আমার এখন অন্য কায আছে, ভায়া তোমরা যুগলে ঘরে যাও” বলিয়া গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া কোচওয়ানকে গাড়ী ফিরাইতে ইঙ্গিত করিয়া ধীরপদবিক্ষেপে বিপরীত দিকে প্রস্থান করিলেন।

প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ

বা

এক লাঠিতে দুই সাপ

ব্রহ্মার স্বপ্ন

রামধন চক্রবর্ত্তীর বালিকা কন্যা টেপু ভোরবেলায় গ্রামের পুকুর-ঘাটে গিয়া কাঁথা কাচিতেছে। তাহার তিন বৎসরের ভাইটী প্রায় এক বৎসর জ্বর ও পেটের ব্যারামে ভুগিতেছে, তিন মাস হইতে এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, একেবারে শয্যাধরা হইয়াছে, বিছানায়ই মলমূত্র ত্যাগ করে; দিনের মধ্যে অনেক বারই বিছানা বদলাইতে হয়। রোগা ছেলে, তাহাতে আবার কোলের ছেলে, মা-ছাড়া হইলেই কাঁদিয়া অস্থির হয়। সুতরাং মা ছেলেকে ফেলিয়া এক পাও নড়িতে পারেন না, আট বছরের মেয়ে

টেপুকেই ঘাটে কাঁথা মাদুর ন্যাকরা কানি কাচিতে যাইতে হয়।

টেপুর নামকরণের সময় ত্রিপুরাসুন্দরী কি ত্রপাশীলা কি এইরূপ একটা কোন জাঁকাল নাম রাখা হইয়াছিল কিনা জানি না। কিন্তু গ্রামের লোকে টেপী বা টেপা বলিয়া ডাকে, মা বাপে আদর করিয়া বলেন, টেপু, খেলার সাথীরা বলিত টেপারী। হয়ত ইহা ছাড়া তাহার কমলা বা ঊষা, বা আর কোন ভাল নাম ছিল। কিন্তু সে নাম কেহ আমলে আনিত না। কলিকাতায় দেখা যায়, ঘরে অনেকে আটহাতী ঠেটী পরিয়া থাকেন, বাহিরে যাইবার সময় ফরাসডাঙ্গার ধুতি পরিয়া লম্বা কোঁচা ঝুলাইয়া বাহার দেন। নামেরও সেইরূপ আটপৌরে পোষাকী আছে। সেকালে ছিল ডাকনাম ও রাশনাম। একালে হইয়াছে আটপৌরে নাম ও পোষাকী নাম। যাহাই হউক, টেপু নাম শুনিয়া কেহ ভাবিবেন না যে, মেয়েটি নিতান্ত কুরূপা। যেমন কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন হইতে আটক নাই, তেমনই অনেক গৌরবর্ণ সুপুরুষের নাম কালী, কৃষ্ণ, ও ভূতনাথ হইতে দেখা যায়। মেয়ের নামের বেলায়ও সেই কথা। বাস্তবিক টেপুর মত সুন্দরী, সে গ্রামে কেন, সে

অঞ্চলে অতি অল্পই ছিল। অমন দুধে-আলতা রং, অমন টানা টানা পটোলচেরা চোখ, অমন তুলি দিয়ে চিত্র করা ভুরু, অমন বাঁশীর মত নাক, অমন নবদ্বীপের কুমারের হাতে-গড়া ভগবতী-প্রতিমার মত মুখ, অমন গোল গোল নরম নরম হাত পা, দেখিলেই মনে হইত যেন দেবকন্যা। টেপুকে দেখিলে, 'অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী' এই বচনটি সার্থক বলিয়া মনে হইত। যার ঘরে এমন সুলক্ষণা মেয়ে, তা'র ঘরে যে ব্যারাম পীড়া আপদ্ বালাই আসে ইহাই আশ্চর্য্য।

এত ভোরে ঘাটে কেহ আসে নাই। টেপু ঐটুকু মেয়ে, কিন্তু তাহাকে সংসারের অনেক কাযই করিতে হয়। মা সর্ব্বদাই রোগা ছেলে লইয়া ব্যস্ত, তাঁর নিজের শরীরও ভাল নহে, ঘরে আর কেহ নাই, কাযেই ভোর ভোর থাকিতে ঘাটে আসিয়া কাঁথা মাদুর কাচিয়া না গেলে টেপু সারাদিন কাযের উলকূল পায় না। আর ময়লা কাঁথা নেকড়া বেলায় কাচিলে গ্রামের আর দশজনের কাছে অনেক গালাগালি খাইতে হয়। টেপু বসিয়া এক এক খানি কাঁথা ও ন্যাকড়া কাচিয়া নিঙ্গরাইয়া ঘাটের ধারে একখানি ছোট পিঁড়ের উপর রাখিতেছে, আবার আর একখানি লইয়া কাচিতেছে। তাহার কায শেষ হইয়া আসিয়াছে,

এমন সময় আশুর মা ঘাটে আসিলেন। আশুর মার কন্যা-কালে কি নাম ছিল তাহা আমরা কেন, গ্রামের কোন লোকই জানে না। গ্রাম্য প্রথানুসারে, সন্তানের নাম-করণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও নূতন নামকরণ হইয়াছিল। বিবাহের পর কয়বৎসর তিনি স্বামীর নামে পরিচিতা ছিলেন, পুত্রবতী হইয়া অবধি তাঁহার পুত্রের নামেই পরিচয়। আশুর মা টেপুকে বড় ভালবাসিতেন; মেয়েটিকে সুশীলা ও সুরূপা বলিয়া গ্রামের সকল স্ত্রীলোকেই ভাল-বাসিত; তবে আশুর মার ভালবাসার আর একটু কারণ ছিল, সে কথা এখনই প্রকাশ পাইবে। টেপুকে দেখিয়া আশুর মা বলিলেন "কি মা টেপু, এত ভোরে তুমি ঘাটে এসেছ? আহা তোমার মার যে কষ্ট, তা' না এলেও ত চলে না। নইলে এত কচি মেয়ের কি এই কায? যা' হোক মা, আজ সকালে উঠে তোর মুখ দেখলাম, দিনটা আমার ভাল যাবে। শেষ রাত্রে স্বপন দেখিছি মা, আমার আশু বাড়ী এসেছে। হায়! আমার এমন কপাল কি হ'বে যে আমার হারানিধিকে ফিরে পাব। তা' মা, শেষ রাতের স্বপন ত ফলে লোকে বলে। আর তোর মুখ দেখলে সুস্বপন ফলতে পারে, তুই যে মা বড় পয়মন্ত মেয়ে।

তুই যার ঘরে যাবি, মা লক্ষ্মী তা'র ঘরে অচলা হয়ে থাকবেন। তুই যে মা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ঠাকরুণ। আহা, মনে মনে কত সাধ ছিল আমার আশুর কল্যাণে যদি ঘরের লক্ষ্মী বরণ ক'রে তুলতে পারি"—টেপু তাহার স্বাভাবিক আগ্রহের সহিত বৃদ্ধার দুঃখের কথা শুনিতেছিল, বৃদ্ধার কথায় তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া আসিতেছিল, কিন্তু আশুর সঙ্গে বিবাহের প্রসঙ্গ উঠিতেই তাহার কেমন লজ্জা হইল, কোন কথা না বলিয়া সে কাঁথাসুদ্ধ পিঁড়ি কাঁকালে করিয়া এক ছুটে বাড়ী পলাইয়া গেল। বৃদ্ধা এত দুঃখেও একটু মুচকি হাসিলেন।

হারানিধি

অনেক সময় স্বপ্ন ফলে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। ঐ দিন দুপুরবেলা একখানি গরুর গাড়ীতে চড়িয়া শ্রীমান্ আশুতোষ চারি বৎসর পরে নিজগ্রামে ফিরিলেন। শ্রীমান্ নিকটস্থ আর একখানি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত স্কুলে পড়িতেন, টেষ্ট পরীক্ষায় সকল বিষয়ে ফেল হওয়াতে এনট্রান্স পরীক্ষা দিতে পান নাই। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম (ষাটের কোলে) প্রায় কুড়ি বৎসর। সঙ্গীদিগের বিদ্রূপে মর্ম্মাহত হইয়া

আশুতোষ একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। অনেক অনুসন্ধানেও তাঁহার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। তাঁহার বিধবা মাতার মনে যে কি কষ্ট হইল, তাহা বোধ হয় আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। বিধবার একমাত্র সম্বল ঐ পুত্রটী। তবে মায়ের প্রাণ সহজে পুত্রের অমঙ্গলের কথা হামরাইতে চাহে না, সেই জন্য পুত্র আত্মহত্যা করিয়াছে বা কোথায় বেঘোরে পড়িয়া মারা গিয়াছে, এরূপ চিন্তা মনে স্থান না দিয়া আশুতোষের মাতা ভাবিলেন তাঁহার বাছা বিবাগী হইয়া গিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছে। হয়ত বাছার একদিন না একদিন মায়ের কথা মনে পড়িবে, তখন ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা হইবে, এই আশায় তিনি বুক বাঁধিলেন।

এতদিনে দুঃখিনী জননীর আশা পূর্ণ হইল। আশুতোষ সত্য সত্যই দেশে ফিরিলেন। শ্রীমানের মুখে শুনা গেল যে. তিনি প্রথমে আড়কাটির কুহকে পড়িয়া আসামের চা-বাগানে কুলি হইয়া চালান যান, পরে চা-বাগানের সাহেবের নিকট আত্মপরিচয় দেওয়াতে এবং তিনি এন্ট্র্যান্স পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন এই কথা বলাতে, সাহেব দয়া করিয়া তাহাকে ৩০ টাকা বেতনে একটি কেরাণীগিরি দেন এবং

ভালরূপ কায দেখানতে সাহেব খুসি হইয়া তাঁহার বৎসর বৎসর বেতন-বৃদ্ধি করিয়া দেন—এক্ষণে তাঁহার বেতন ৬০ টাকা। আশুতোষ নিজের খরচ চালাইয়া এই চারি বৎসরে কিছু সঞ্চয়ও করিয়াছিলেন। চাকরীর সুখও বেশ ছিল। কিন্তু হইলে কি হয়, তিনি আসামের নামজাদা কালাজ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া জেরবার হইয়া পড়িয়াছিলেন। চা-বাগানের ডাক্তারের ব্যবস্থায় ভাল ভাল কুইনিন খাইয়া কিছুই ফল পান নাই। রোগযন্ত্রণায় মাতা ও মাতৃভূমির কথা মনে পড়িয়াছিল। এতদিন মাকে কোন সংবাদ দেন নাই বলিয়া অনুশোচনাও উপস্থিত হইয়াছিল। শেষে তিনমাসের ছুটি লইয়া বাঙ্গালা মুলুকে ফিরিলেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি একটি বিরাট্ অট্টালিকার গায়ে—"বটিকা"র বিজ্ঞাপন দেখিয়া ও তাহার গুণের কথা দশজনের মুখে শুনিয়া এক কৌটা কিনিলেন এবং এই ঔষধের দোকানে সুগন্ধ তৈলের শিশিগুলি সুন্দর সাজান রহিয়াছে দেখিয়া তাহাও একটি কিনিলেন। কলিকাতায় যে দুই চারিদিন থাকিলেন, সেই কয়দিন ঔষধ-সেবনেই বেশ ফল বুঝিতে পারিলেন। রোজ বৈকালে একটু ঘুস-ঘুসে জ্বর হইত, মাথা ধরিত, গা হাত পা জ্বালা করিত,

এই কয়দিনে সে সব লক্ষণের উপশম হইল। তিনি তাহার পর দেশে রওয়ানা হইলেন।

হারানিধি পাইয়া আশুতোষের মাতার যে কত আনন্দ তাহা আর কি বলিব? তিনি কখন হাসিতেছেন, কখন কাঁদিতেছেন, কখন পুত্রকে তিরস্কার করিতেছেন, কখন আদর করিতেছেন, কখন গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছেন, কখন বাতাস করিতেছেন। তাহার পর তাড়াতাড়ি পাঁচ ব্যঞ্জন ভাত রাঁধিয়া পুত্রকে খাওয়াইলেন। মাতা ও পুত্র উভয়ের তৃপ্তি হইল। সংবাদ পাইয়া গ্রামের সকল স্ত্রী-পুরুষ হারানিধিকে দেখিতে আসিল। আশুতোষ সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া মিষ্টালাপ করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা তাঁহার ব্যবহারের জন্য অনুযোগ করিলেন; সমবয়স্ক সঙ্গীরা পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া প্রথম প্রথম তাঁহার সহিত আলাপ করিতে একটু লজ্জাবোধ করিল, তাহার পর সকলে বেশ প্রাণ খুলিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে লাগিল।

গ্রামের সকলেই আশুতোষকে দেখিতে আসিয়াছিল। কেবল টেপুর মা-বাপ রোগী শিশুকে লইয়া ব্যস্ত থাকায় আসিবার অবকাশ পান নাই। বৈকালে আশুতোষ যখন বেড়াইতে বাহির হইলেন, তখন তাঁহার মাতা তাঁহাকে

বলিলেন,—“বাবা, টেপুকে তোমার মনে পড়ে? সেই ছোট ফুটফুটে দুধের মেয়েটি। তুমি প্রায়ই কোলে ক’রে বাড়ী আনতে আর বলতে যে মা, দেখ কেমন টুক্‌টুকে মেয়েটি, আহা আমার যদি এমনি একটি বোন থাকত। তা’ বাবা এখন সে ঘাটের একটু বড়সড় হয়েছে। তা’দের বড় বিপদ্! তুমি দেশ ছাড়বার পর তা’র একটি ছোট ভাই হয়েছে, সেটি কিছুদিন হ’তে জ্বর আর পেটের ব্যারামে ভুগছে, বাঁচবার আশা নাই। যাও অনেক দিন পরে এলে, একবার তাদের তত্ত্ব নাওগে। চক্রবর্ত্তী মশায় মাটির মানুষ।” বলা বাহুল্য আশুতোষ ফিরিয়া আসাতে এবং তাঁহার ভাল বেতনে চাকরী হওয়াতে তাঁহার মাতার মনে টেপুর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দেওয়ার আশা আবার জাগিয়াছে। তাই তিনি একটু বুদ্ধি করিয়া আশুতোষকে তাহাদের বাড়ী আপ্যায়িত করিতে পাঠাইলেন।

আশুতোষেরও অবশ্য টেপুর কথা বেশ মনে ছিল। তিনি বলিলেন, “মা, আমি আমার পুরাতন জ্বরের জন্য কলিকাতা হইতে যে ওষুধ এনেছি সেটাতে ত ছেলেটির উপকার হ’তে পারে।” আশুতোষের মা বলিলেন “তা, বেশ ত ওষুধটা সঙ্গে নিয়ে যাও না। আমাদের পাড়াগাঁয়ে

ত ভাল ওষুধ পাওয়া যায় না। এ ওষুধে যদি উপকার হয় তবে ত ছেলেটি এযাত্রা রক্ষে পায়।" আশুতোষ তাহাই করিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সঙ্গে দেখাশুনা করিয়া কয়েকটি বটিকা তাঁহাকে দিয়া আসিলেন। এবং রোজ সকালে বিকালে গিয়া রোগীর অবস্থা দেখিতে লাগিলেন। ৫।৭ দিনের মধ্যেই বেশ উপকার বুঝা গেল, জ্বর অনেক সময় থাকে না (পূর্ব্বে চব্বিশঘণ্টাই লাগিয়া থাকিত), অন্যান্য উপসর্গের হ্রাস হইল, পেটের পীড়া নির্দ্দোষ হইয়া সারিয়া গেল। পনর দিনে শিশু খাড়া হইয়া উঠিল। চক্রবর্ত্তী কর্ত্তা-গৃহিণীর আহ্লাদের আর সীমা থাকিল না। তাঁহারা আশুতোষকে সাক্ষাৎ দেবতা-জ্ঞানে আদর করিলেন।

বিবাহ ও ফুলশয্যা

চক্রবর্ত্তীর ছেলেটি বেশ সারিয়া উঠিল। এদিকে আশুর মা চুপ করিয়া না থাকিয়া টেপুর সঙ্গে তাহার যাহাতে বিবাহ হয় তলায় তলায় সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বরের মা হইয়া নিজে প্রস্তাব করিলে খাট হইতে হইবে এই ভাবিয়া কয়েকজন প্রতিবাসিনী দ্বারা কথাটা টেপুর মার

কাণে তুলিলেন। লোকে কন্যার বর খুজিতে হয়রান হয়, আর টেপুর বেলায় আপনি সম্বন্ধ উপস্থিত হইল, ইহাতে চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও তাঁহার পত্নী খুব খুসী হইলেন। আর আশুতোষও যোগ্যপাত্র, চাকুরী করিতেছে, তাহার উপর সম্প্রতি শিশুটির প্রাণরক্ষা করিয়াছে, সেজন্য তাঁহারা তাহার উপর খুবই রাজী। তাহা ছাড়া মেয়েটিকে দূরদেশে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইতে হইবে না, কাছে-কাছেই থাকিবে, অপরন্তু চক্রবর্ত্তী মহাশয় গৌরীদানের ফল পাইবেন বলিয়া তাঁহার খুব আহ্লাদ। টেপুর মার আরও আহ্লাদ। তাঁহারা প্রস্তাব শুনিয়া কৃতার্থ হইলেন। সত্বরই কথার একটা পাকাপাকি হইয়া গেল। আশুতোষের মাতা এমন সুলক্ষণা সুন্দরী বধূ ঘরে আনিবেন এই আহ্লাদে কন্যাকর্ত্তার নিকট নয় শ পঞ্চাশ চাহিয়া বসিলেন না। চক্রবর্ত্তী মহাশয় সাধ্যমত যাহা দিতে পারেন, আশুর মাতা তাহাতেই সন্তুষ্ট; তিনি বলিলেন "ছেলেই আমার কত টাকা রোজগার করে। তা'র আবার পয়সার ভাবনা কি? আর মেয়ে বেচার মত আমি ত আর ছেলে বিক্রী করতে বসিনি।" বড় আশ্চর্য্যের কথা। আশুর মা যদি বর্ত্তমান কালের শিক্ষিত শ্রেণীর লোক হইতেন তাহা হইলে

তিনি নিশ্চয় পুত্রের ওজনে সোণা রূপা হীরা জহরৎ লইবার কোট ধরিতেন।

বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতেছে এ সংবাদে আশুতোষের মনের ভাব কিরূপ হইল? আসামের চা-বাগানে চারি বৎসর ধরিয়া কেবল কুলীরমণীদিগের রূপরাশি দেখিয়া দেখিয়া তাঁহার রমণীতে অরুচি জন্মিয়াছিল, দেশে টেপুর নিটোল গঠন টুকটুকে রং ও সুন্দর চোখ মুখ দেখিয়া তাঁহার চক্ষুঃ জুড়াইয়াছিল। আসিয়া অবধি রোজ টেপুদের বাড়ী যাতায়াত করিতে করিতে টেপুকে তাঁহার খুব মনে ধরিয়াছিল। তাঁহার মা যদি এ বিষয়ে উদ্‌যোগী না হইতেন তাহা হইলে বোধ হয় নিজেই বিবাহের ঘটকালী করিতে প্রবৃত্ত হইতেন এবং চক্রবর্ত্তী মহাশয় সম্মত না হইলে শ্রীমান্ আবার দেশত্যাগী হইতেন!

আর আট বছরের মেয়ে টেপু—তাহার কিরূপ মনের ভাব হইল? বিবাহ কি পদার্থ তাহা সে ভাল বুঝে না, তবে বিবাহের কথায় কেমন একটা লজ্জা আসিয়া পড়ে, অথচ মনে মনে কেমন একটু উল্লাসও হয়, তাহার মনের এ উভয় অবস্থাই হইয়াছিল। বিবাহ হইলে খেলার সঙ্গীদিগকে ছাড়িয়া মা বাপ ভাই বন্ধুকে ছাড়িয়া দূরদেশে 'বনবাসে' যাইতে হইবে না ইহাতে টেপুর খুব আহ্লাদ।

তবে সে সঙ্গিনীদিগের কাছে 'পাশকরা বর' 'পাশকরা বর' একটা কথা শুনিত, এখনকার মেয়েরা ত আর সাধ করে না 'রামের মত পতি পা'ব' কি 'শিবের মত বর পা'ব'; তাই আশুতোষ পাশকরা নহেন বলিয়া বালিকার মন যেন একটু ক্ষুণ্ণ, একটু অপ্রসন্ন।

যাহা হউক শুভদিনে শুভক্ষণে শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হইল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় যথাশক্তি গ্রামের দশজনকে ফলাহার করাইলেন। আশুর মা বৌ-বেটা বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন ও ঘটা করিয়া বৌভাত দিলেন।

আজ ফুলশয্যার রাত্রি। একবার চতুর্ব্বিংশতি-বর্ষীয় বর ও অষ্টবর্ষা বধূর আলাপটা আড়ি পাতিয়া শুনিলে হয় না?

বর। টেপু, ও টেপু, ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়ে? সেই তুমি কা'রও হাতে দুধ খেতে না। কিন্তু আমি তোমাদের বাড়ী গেলেই আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে ও আমি কোলে ক'রে দুধের বাটী মুখে ধরলে চোঁ চোঁ ক'রে খেয়ে ফেলতে। এখন তেমন ক'রে দুধের বাটী ধরলে চুমুক দেবে ত?"

টেপু ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল, অনেক চেষ্টায়ও হাসি চাপিতে পারিল না। এবার আশু বলিল, "আচ্ছা

তোমাকে দুধের বাটীতে চুমুক দিতে হ'বে না, তার চেয়ে একটা সোজা কায করলেই চলবে।" এই বলিয়া আশুতোষের মনে একটা খেয়াল চাপিল। সেই যে কলিকাতা হইতে একশিশি গন্ধতৈল আনিয়াছে, সে আর কখন্ কোন্ কাযে লাগিবে? এই মনে ভাবিয়া আশু আস্তে আস্তে বিছানা হইতে উঠিয়া কুলুঙ্গী হইতে শিশিটা নামাইয়া লইয়া একটু তৈল টেপুর ঘোমটা সরাইয়া কাল কাল কোঁচকান কোঁচকান চুলগুলিতে লাগাইয়া দিল। সুগন্ধে ঘর আমোদিত হইল। ফুলশয্যায় বিছান ফুলের সুঘ্রাণও তাহার কাছে হারি মানিল। টেপু বালিকাসুলভ কৌতূহলের সহিত শুধাইল—ছি ছি! বিয়ের কনে ফুলশয্যায় কথা কহিয়া ফেলিল—"ও কি?" আশু বলিল "কলকাতা হ'তে এই তেল এনেছি, সরেস তেল, তাই তোমার 'লক্ষ টাকার মূল' খোঁপায় একটু মাখিয়ে দিয়ে হাত শুদ্ধ করলাম।"

টেপু আর কিছু বলিল না। মাথা ঠাণ্ডা হওয়াতে শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুমের ঘোরে সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিল। সে সবিস্ময়ে দেখিল, যেন এক শ্বেতশ্মশ্রু দিব্য-পুরুষ তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া, পরিধানে পট্টবাস,—তিনি বলিতেছিলেন, "অয়ি

বালিকে, আমি প্রজাপতি। যে প্রজাপতি গায়ে বসিলে তোমরা পরস্পরকে উপহাস কর যে শীঘ্রই বিবাহের ফুল ফুটিবে, আমি সে প্রজাপতি নহি। আমি প্রজাপতি ব্রহ্মা, আমারই নির্ব্বন্ধে শ্রীমান্ আশুতোষের সঙ্গে তোমার শুভ-বিবাহ সংঘটিত হইয়াছে। তুমি পাশকরা বর পাও নাই বলিয়া মনে দুঃখ করিয়াছ, তাই তোমাকে অভয় দিতে আসিয়াছি। পাশে কি ফল? তোমার স্বামী যে রোজ-গার করিতেছে, তাহা বি-এ পাশ করার ভাগ্যেও যোটে না! তবু যদি তোমার পাশের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে তাহার উপায় বলিয়া দিতেছি। যে তৈল তোমার বর তোমার চুলে মাখাইয়া দিয়াছেন তাঁহাকে তাহাই নিয়মিত ব্যবহার করিতে বলিবে। তাহাতে তাঁহার মেধাবৃদ্ধি হইবে, স্মৃতিশক্তি প্রখর হইবে, বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হইবে, তিনি অনায়াসে আগামী বৎসরে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন। আমারই ইচ্ছায়—ঘটিকা দ্বারা তোমার ভ্রাতার প্রাণরক্ষা হইয়াছে ও তোমাদের বিবাহের পথ প্রস্তুত হইয়াছে। এই তৈলেও অভিপ্রেত ফল পাইবে। ইহাও আমার ইচ্ছাধীন।” এই বলিয়া প্রজাপতি ঠাকুর অন্তর্দ্ধান হইলেন। বালিকারও চটকা ভাঙ্গিয়া গেল।

টেপুর হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে আশুতোষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি! অমন ক'রে উঠলে যে? ক্ষিদে পেয়েছে কি? একটু দুধ গরম ক'রে আনব কি?" টেপু বলিল,—"যাও!" তাহার পর অনেক সাধ্যসাধনার পর আশুতোষ ভিতরের কথা জানিয়া লইলেন। স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া আশুতোষ একটু লজ্জিত হইলেন, টেপুর মনের অভিলাষটা কি তাহার বেশ একটু আঁচ পাইলেন। যাহা হউক সুখের রাত্রি যথাসময়ে প্রভাত হইল।

শেষরক্ষা

[শুভ বিবাহেই নভেল শেষ হয়। কিন্তু যে দেশে 'বাল্যবিবাহ' প্রচলিত, সে দেশে গল্পটি ঘোরালো করিতে হইলে বিবাহের পরবর্ত্তী জীবন কতকটা চিত্রিত না করিলে উপায় নাই।]

পরদিন আশুতোষ ভিন্ন গ্রামের স্কুলের হেড্মাষ্টার মহাশয়ের নিকট গেলেন, তখনও ভর্ত্তির সময় অতিবাহিত হয় নাই, তিনি যথারীতি স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন ও 'কেঁচে গণ্ডূষ' করিলেন। কেহ বা তাঁহার অধ্যবসায়ের প্রশংসা করিল, কেহ বা টিটকারী দিল। আশুতোষ নবদ্বার-

নিষিদ্ধবৃত্তি হইয়া অধ্যয়নে রত হইলেন। এবং যথাসময়ে টেষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাদানের অনুমতি পাইলেন। পরিশ্রমের ফলেই হউক, পরিণত বয়সের প্রভাবেই হউক, সেই তৈলের গুণেই হউক, অথবা ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষায় কল্যাণেই হউক, আশুতোষ এবার প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলেন। টেপু পাশ-করা বর পাইয়া কৃতার্থ হইল, আমরাও তাহার সুখে সুখী। *

---

* এক সময়ে গন্ধতৈলের বিজ্ঞাপন-হিসাবে গল্প-রচনার খুব একটা ধূম পড়িয়াছিল, এজন্য পুরস্কার-ঘোষণাও হইত। এখনও এই তরঙ্গ একেবারে যায় নাই। এই শ্রেণীর রচনার উপর বিদ্রূপ করিবার জন্য বর্ত্তমান গল্পটি লিখিত হইয়াছিল। পাঠকবর্গ এই ভাবে গল্পটি বুঝিলেই শ্রম সার্থক বিবেচনা করিব।

ফলিত জ্যোতিষ

গণনা

প্রতি রবিবারে ও অন্যান্য ছুটির দিনে ভোরবেলা হইতে বেলা দুপুর পর্য্যন্ত জ্যোতিষ বাবুর 'বৈঠকখানা-ঘরে' বিষম ভিড় হয়। সে ভিড় গীতবাদ্যের বা তাসপাশার আকর্ষণে জমায়েত হয় না। বাবুটি আফিসের বড় বাবু নহেন, তথাপি তাঁহার কাছে এত লোক-সমাগম হয় কেন ? এইরূপ প্রচার যে, তিনি করকোষ্ঠী বিচারে অদ্বিতীয় ; এবং সে জন্য রজত-দক্ষিণা গ্রহণ করেন না ; কেবল পরোপকারের জন্যই এত শ্রম স্বীকার করেন। এমন বে-খরচায় ভবিষ্যৎ জানিতে পারিলে কাহার না সে বিষয়ে কৌতূহল হয় ? এ অবস্থায় কেন এত লোকে তাঁহার দ্বারস্থ হয় এবং তাঁহার নিম্নতলস্থ অপ্রশস্ত 'বৈঠকখানা-ঘরে' কেওড়া-

কাঠের ছারপোকা-সমাকুল তক্তপোষের উপর বিছান ধূলিধূসরিত, স্থান স্থানে ছিন্ন, লাল-কাল প্রভৃতি নানাবর্ণের মসীরঞ্জিত শতরঞ্চে ঠেসাঠেসি করিয়া বসিয়া থাকে, তাহা সহজেই অনুমেয়। কাহার কবে চাকরী হইবে, কাহার কবে বেতন বৃদ্ধি হইবে, কাহার কবে অবস্থার উন্নতি হইবে, কাহার কবে পুত্রলাভ বা স্ত্রীবিয়োগ হইবে, কাহার কবে বড় ঘরে পুত্রকন্যার বিবাহ হইবে ইত্যাদি বিষয়ে তিনি বর্ষমাস কেন, দিন ঘণ্টা মিনিট পর্য্যন্ত ঠিকঠাক গণিয়া বলেন, আর সে সব কথা হুবহু ফলিয়া বা মিলিয়া যায় বলিয়া তাঁহার ভক্তমহলে খুব একটা নামডাক ছিল।

একদিন বেলা ৯টার সময় মোটরবিহারী একজন সুশ্রী ও সুবেশ যুবক একটি সহচর-সঙ্গে জ্যোতিষীর দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গীটি নাছোড়বান্দা, জ্যোতির্ষীর অশেষ গুণগান করিয়া যুবককে এখানে আসিতে সম্মত করাইয়াছেন। যুবকটি ধনী, মানী, বিদ্বান্ ও সচ্চরিত্র, নাম রমণীমোহন; পিতা, পিতৃব্য, মাতুল প্রভৃতি অবিভাবক-অভাবেও অসৎসঙ্গ করেন নাই, কোনও রূপ বদখেয়াল নাই, পরন্তু সুখ্যাতির সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসাগর উত্তীর্ণ হইয়া দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর এম্ এ

উপাধিভূষিত হইয়াছেন এবং আপাততঃ আইন অধ্যয়ন করিতেছেন। সম্প্রতি একটি রূপবতী গুণবতী ধনিকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ-সম্বন্ধ হইয়াছে। কন্যাটি ধনী পিতার একমাত্র সন্তান। সুতরাং একক্ষেত্রেই কামিনী ও কাঞ্চন-লাভ ঘটিবে। বর স্বয়ং কন্যা দেখিয়া পছন্দ করিয়াছেন (ইহাই হইল হাল-আইনের শুভদৃষ্টি—অর্থাৎ ভোগের আগে প্রসাদ বা বোধনের আগে দেবীবরণ) এবং মধুময় পরিণয়ের জন্য উন্মুখ হইয়া দিন গণিতেছেন। ভাবী জীবনে দাম্পত্যসুখে কিরূপ সুখী হইবেন, বোধ হয়, তাহা জানিবার প্রচ্ছন্ন কৌতূহল তাঁহার জ্যোতিষীর নিকট আসিতে সম্মত হইবার মূলে ছিল।

সূর্য্যোদয় হইতেই করকোষ্ঠী দেখা চলিতেছিল। লোক-সমাগম বেলাবৃদ্ধির সঙ্গে বাড়িতেছিল বই কমিতেছিল না। ঠিক যেন রেল-গাড়ীর থার্ড ক্লাস। যাহা হউক, যাহাদের ভাগ্যপরীক্ষা হইয়া গিয়াছিল অথচ অপরের সম্বন্ধে মন্তব্য শুনিবার লোভে স্থানত্যাগের বড় ইচ্ছা ছিল না, বিশিষ্ট ভদ্রলোক দেখিয়া তাহারা অনেকে উঠিয়া দাঁড়াইল, অপর সকলেও যথাসম্ভব সরিয়া সরিয়া বসিল, কষ্টেসৃষ্টে আগন্তুক-দ্বয়ের জন্য শতরঞ্চের এক কোণে একটু স্থান হইল। গণৎ-

কার আফিসে কি বেশে বাহির হয়েন, জানি না, তবে এক্ষেত্রে ত তাঁহার পরনে পট্টবস্ত্র, গলায় রুদ্রাক্ষমালা, কপালে দীর্ঘ ত্রিপুণ্ড্রক, মস্তকে জটাযুক্ত অথচ সুবিন্যস্ত কেশ; চেহারাটিও দর্শনধারী বটে। আরও যে কয়েকজন 'তীর্থের কাকের' মত প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, জ্যোতিষী একটু চটপট তাঁহাদিগের কার্য্য সমাধা করিয়া এই সুবেশ ভদ্রলোকটির দিকে ঝুঁকিলেন। তাঁহাকে দক্ষিণ করতল প্রসারিত করিতে বলিয়া নিজের দক্ষিণ হস্তে তাহা তুলিয়া লইলেন এবং অনেকক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখের ভাব যেন কেমনতর হইয়া গেল, তিনি যেন চমকিত হইয়া ধৃত হস্ত ছাড়িয়া দিলেন। পরে একটু সামলাইয়া লইয়া বাম করতল দেখিতে চাহিলেন। বাম করতলে দৃষ্টি বিন্যস্ত করিয়াও তাঁহার পূর্ব্বভাবের ব্যত্যয় হইল না। আশেপাশে উপবিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া ত্রস্ত হই-লেন। রমণী বাবুও একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে আচ্ছন্ন হই-লেন। যাহা হউক, জ্যোতিষীর বহুলোক লইয়া কারবার করিতে হয়, এরূপ ভড়কাইলে চলে না। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং যেন এতক্ষণে করকোষ্ঠী উদ্ধার

করিয়াছেন, এই ভাব দেখাইয়া কতকগুলি বাঁধা বুলি আওড়াইতে লাগিলেন,—"আপনি দীর্ঘজীবী, নীরোগ, যশস্বী ও সর্ব্বসুখে সুখী হইবেন, রূপবতী গুণবতী পত্নী লাভ করিবেন, এবং স্ত্রীর সঙ্গে সম্পত্তি লাভ করিবেন। শীঘ্রই আপনার একজন দূর আত্মীয় বা আত্মীয়ার সম্পত্তিও আপনার লভ্য হইবে।" এই বলিয়া তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়া জ্যোতিষী এক জন নবাগতের দিকে ফিরিলেন ও তাঁহার করকোষ্ঠী-বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। রমণী বাবু ও তাঁহার সহচর অগত্যা জ্যোতিষীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রমণী বাবু কিন্তু ভিতরে ভিতরে বড়ই উদ্‌বিগ্ন হইলেন, তিনি বেশ বুঝিলেন, জ্যোতিষী কি একটা অশুভ কথা গোপন করিয়া গেলেন। পথে যাইতে যাইতে সঙ্গীর সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি তাহাকে একটা ছলে বিদায় দিয়া আবার ফিরিয়া জ্যোতিষীর গৃহাভিমুখে গেলেন এবং একটু তফাতে থাকিয়া সকলের প্রস্থানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সকলে চলিয়া গেলে তিনি ধীরে ধীরে জ্যোতিষীর সম্মুখীন হইলেন। জ্যোতিষী তাঁহাকে আবার আসিতে দেখিয়া

একটু বিচলিত হইলেন। তথাপি সে ভাব গোপন করিয়া হাসিমুখে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন ও বসিতে বলিলেন। রমণী বাবু বেশী ভূমিকা না করিয়া অনুচ্চস্বরে বলিলেন, "দেখুন, আপনি তখন কি একটা অশুভ কথা আমার কাছে গোপন করিলেন। বোধ হয়, বেশী লোকজন ছিল বলিয়া চাপিয়া গিয়াছেন, এখন নিরিবিলি আমাকে কথাটি বলিতে হইবে।" জ্যোতিষী এড়াইবার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রমণী বাবু তাঁহাকে এমন করিয়া ধরিয়া বসিলেন (এবং এক শত টাকা পুরস্কারের লোভ দেখাইলেন) যে, শেষে জ্যোতিষীকে বাধ্য হইয়া গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিতে হইল। তিনি আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, "আপনার দ্বারা এক জনের প্রাণের হানি হইবে, কররেখা হইতে এইরূপ যেন একটা আভাস পাওয়া যায়। তবে হয় ত আমার বিচারে প্রমাদ ঘটিয়াছে, কেন না, মানুষ অভ্রান্ত নহে, আর আমাদের শাস্ত্রও বড় জটিল। অতএব আপনি ইহার জন্য দুশ্চিন্তা করিবেন না। 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি' এই ঋষিবাক্য স্মরণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন।" এই কথার পর রমণী বাবু শুষ্কমুখে অবসন্ন-হৃদয়ে প্রস্থান করিলেন।

ভাবনা

কি কুক্ষণে রমণী বাবু পার্শ্বচরের প্ররোচনায় জ্যোতিষীর গৃহে যাইতে সম্মত হইয়াছিলেন, জ্যোতিষীর মুখে গুপ্ত কথা ব্যক্ত হওয়ার পর হইতে তাঁহার মনের সুখশান্তি একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। তিনি আকাশ-পাতাল ভাবনায় পড়িলেন। এই সবেমাত্র সুরূপা ধনিকন্যার সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে, বিমল প্রণয়ের রঙ্গীন স্বপ্নে তাঁহার নবীন হৃদয় রাঙ্গিয়া উঠিয়াছে, আর সেই সময়ে এই নিদারুণ অদৃষ্টগণনা। এ যে বিনা-মেঘে বজ্রাঘাত। বিবাহের পরে, যে কোন সময়ে খুনের অপরাধে ধৃত ও দণ্ডিত হইলে তাঁহার নিজের জীবন ত ব্যর্থ হইবেই, সঙ্গে সঙ্গে সুখের ক্রোড়ে পালিতা প্রিয়তমা পত্নীর জীবন চিরদিনের মত বিষময় হইবে, ধনী মানী শ্বশুরের উচ্চ মাথা হেঁট হইবে, পিতৃকুল শ্বশুরকুল উভয়ই কলঙ্কের কালিমাকীর্ণ হইবে। এ অবস্থায় অন্ততঃ পরের মেয়েকে সারা-জীবনের জন্য দুঃখসাগরে না ভাসাইয়া চিরকুমার থাকাই সুবিবেচনার কার্য্য। অথচ বিবাহের সব ঠিকঠাক হইয়াছে, দিনস্থির পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে, এখন কি উপায়েই বা তিনি বিবাহ-

সম্বন্ধ ভাঙ্গেন, কিছুই কূলকিনারা পাইলেন না। আবার বিবাহের আশা ত্যাগ করিতেও তাঁহার মন সায় দেয় না। সুন্দরীর লোভ দুর্দ্দমনীয়, সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিবার চেষ্টা অসাধ্য। এই বিষম সমস্যা লইয়া তিনি তিন দিন তিন রাত্রি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দারুণ অশান্তিতে, অসহ্য যন্ত্রণায় কাল অতিবাহিত করিলেন। এমন কেহ অন্তরঙ্গ বন্ধু নাই যে, তাহার কাছে এই গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া মনের ভার লাঘব করেন, এবং তাঁহার কাছ হইতে উপায়-নির্দ্ধারণ-সম্বন্ধে সৎপরামর্শ গ্রহণ করেন। যাহা হউক, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি দুই প্রবল অথচ পরস্পর-বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির মধ্যে এইভাবে রফা করিলেন,—কাহাকেও অতি গোপনে ও সুকৌশলে খুন করিয়া সেটা চাপিয়া রাখিবেন এবং কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিবেন যে, খুনের আস্কারা হইল না, আর শাস্তির ভয় নাই, তখন নিশ্চিন্তমনে বিবাহ করিবেন। আর খুনও এমন লোককে করিবেন, যাহার মরণে জগতের কোনও ক্ষতি হইবে না, কোনও পরিবারের আর্থিক বা মানসিক কষ্ট হইবে না, যাহার মৃত্যু শোচনীয় অকালমৃত্যু বলিয়া নিরতিশয় দুঃখের কারণ হইবে না। মীমাংসাটা তর্ক-বিজ্ঞান ও

নীতিবিজ্ঞানে পারদর্শী চরিত্রবান্ লোকের মত হইল কি না, পাঠকবর্গ তাহার বিচার করিবেন।

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তিনি তখন পাত্র ও প্রণালী স্থির করিতে মনঃসংযোগ করিলেন। পাত্র—শ্রীবিষ্ণুঃ—পাত্রী অল্প আয়াসেই নির্ব্বাচিত হইল। তাঁহার দিদি-মার এক দূর-সম্পর্কীয়া ভগিনী বহু বৎসর যাবৎ কাশীবাস করিতে-ছিলেন, অশীতিপর বৃদ্ধা, মধ্যে মধ্যে শূল-বেদনায় যমযন্ত্রণা ভোগ করে, অথচ বুড়ী মরিবার নামও করে না; মরিতে পারিলেই বুড়ী যেন বাঁচে। বুড়ী মরিলে তাহার জন্য শোক করিবে, এমন লোক তিন কুলে কেহ নাই। বুড়ীর সঞ্চিত ধনও বিস্তর, তাহার একমাত্র ওয়ারিশান রমণী বাবু স্বয়ং। এ অবস্থায় তাঁহার বিবেচনায় বুড়ীর ভববন্ধন ঘুচাইয়া দেওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কাশীতে অপমৃত্যু হইলেও শিবত্ব-প্রাপ্তিতে বাধা নাই, অতএব ঐহিক পারত্রিক উভয়তঃই ইহা শ্রেয়ঃ পন্থাঃ।

এইবার উপায়-নির্দ্ধারণের পালা। রমণী বাবু দর্শন-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া সম্প্রতি সৌখীন (amateur) ভাবে বিজ্ঞান লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিলেন। এখন এই কার্য্যের জন্য তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে রসায়ন-শাস্ত্রের রহস্য-

উদ্ঘাটনে ব্যাপৃত হইলেন। অনন্যকর্ম্মা হইয়া বহু গ্রন্থ ও গবেষণাত্মক প্রবন্ধ-নিবন্ধ ঘাঁটিয়া, বহু বিজ্ঞান-শালায় ঘুরিয়া, বহু বৈজ্ঞানিকের সহিত তত্ত্বালোচনা করিয়া তিনি অবশেষে এমন একটি বিষের সন্ধান পাইলেন, যাহার ক্রিয়া যন্ত্রণাহীন। (অবশ্য, বিষের নামটি পাঠকবর্গকে জানাইতে সাহস হয় না। কেন না, কাহার মনে কি আছে, কে জানে ?) ইহা হইতে প্রস্তুত লজেঞ্জুসের মত মিষ্টস্বাদ এক প্রকার বটিকা বিষপ্রয়োগ-কার্য্যে বৈজ্ঞানিক-জগতে বিনিয়োজিত হয়। সাধারণতঃ ঔষধালয়ে যাহাকে তাহাকে এই বিষাক্ত মোদক বিক্রয় করে না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক-সমাজে রমণীবাবুর খাতির যথেষ্ট, আর পয়সার অসাধ্য কিছুই নাই। তাঁহাকে উক্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। কার্য্যসিদ্ধির প্রথম সোপান উত্তীর্ণ হওয়াতে তাঁহার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল।

সাধনা

তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া একাকী কাশীযাত্রা করিলেন। তথায় গিয়া কাশীর প্রস্তুত একটি সুদৃশ্য কাঠের কৌটায় বটিকাটি পুরিয়া পকেটে ফেলিলেন এবং অবি-

লম্বে বৃদ্ধার চরণ বন্দনা করিতে গেলেন। রমণী বাবুই বৃদ্ধার উত্তরাধিকারী, সুতরাং বৃদ্ধার তাঁহার উপর একটু আবদার অভিমান করিবার অধিকার ছিল। নাতিকে সম্মুখে পাইয়াই তিনি খুব একচোট লইলেন, "কথনও একবার পথ ভুলেও আস না; তা' আস্‌বে কেন? বুড়ীর আদর কে কোন্ কালে করে? এখন আবার রাঙ্গা নাতবৌ ঘরে আস্‌বে, সেই চিন্তেয়ই মগ্ন আছ।" নাতির কুশল-প্রশ্নে উত্তর করিলেন, "আর দাদা ও কথা শুধিও না। শূল-বেদনা যখন ওঠে, তখন যে কি যন্ত্রণা তা'র আর কি বল্‌ব? তখন ইচ্ছে করে, আপ্তঘাতী হ'য়ে জ্বালা জুড়ুই, তবে আত্ম-হত্যে মহাপাপ, তাই কর্‌তে পারিনে।" এ কথা শুনিয়া রমণী বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "দিদিমা, আর তোমাকে সে যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হ'বে না, আমি কল্‌কাতা থেকে এমন ওষুধ এনেছি যে, তা' একবার খেলে আর কখনও বেদনা উঠবে না।" বুড়ী সাগ্রহে বলিল, "কৈ দাও দাদা, এখনি খেয়ে ফেলি।" রমণী বাবু একটু ফাঁফরে পড়িলেন। তাঁহার ইচ্ছা নহে যে, তিনি উপস্থিত থাকিতেই বুড়ী বিষাক্ত বটিকা গলাধঃকরণ করে, কেন না, সে ক্ষেত্রে বুড়ীর আকস্মিক মৃত্যুর সহিত তাঁহাকে জড়াইতে পারে। তিনি একটু

সামলাইয়া লইয়া বলিলেন "না, দিদিমা, ওষুধটা যখন তখন খাবার নয়। যখন বেদনা উঠবে, তখুনি গিলে ফেল্‌বেন, সকল যন্ত্রণা দূর হ'বে।" এই বলিয়া তিনি কৌটাটি বুড়ীর হাতে দিলেন এবং দুই চারিটা কথার পর আজই বিশেষ দরকারে দিল্লী যাইতে হইবে বলিয়া চটপট বিদায় লইলেন। বড় ভয়, পাছে তিনি থাকিতে থাকিতেই বুড়ীর বেদনা উঠে ও বুড়ী তৎক্ষণাৎ বটিকা ভক্ষণ করিয়া তাঁহাকে কোনও ফ্যাসাদে ফেলে।

কাশীতে তাঁহার কার্য্য আপাততঃ ফুরাইল; তিনি জ্ঞানকৃত পাপের জন্য জ্ঞানবাপীর জল মাথায় ছিটাইয়া সেই দিনকার ট্রেনেই দিল্লী রওনা হইলেন এবং তথায় পৌঁছিয়া কলিকাতার কর্ম্মচারীকে ঠিকানা জানাইলেন। দিল্লীতে বসিয়া বসিয়া তিনি উৎকণ্ঠিতচিত্তে বুড়ীর মৃত্যুসংবাদের 'তার' পাইবার জন্য দিন কাটাইতে লাগিলেন। মাসখানেকের মধ্যেই খোসখবর আসিল, তাঁহার দুর্ভাবনা ঘুচিল, তিনি বুড়ীর শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য ও সম্পত্তির দখল লইবার জন্য কাশী ছুটিলেন। শাস্ত্রের অনুশাসন, পিণ্ডং দত্ত্বা ধনং হরেৎ।

মহাসমারোহে শ্রাদ্ধকৃত্য সমাপ্ত হইল। বুড়ীর সঞ্চিত

অর্থ অনেক ছিল, রমণী বাবু তৎসমস্ত গ্রাস করিতে ব্যগ্র ছিলেন না, সুতরাং উহার অধিকাংশ ব্যয় করিয়া খুব ঘটা করিয়া শ্রাদ্ধ হইল। শ্রাদ্ধাদির পর এক দিন বুড়ীর শয়ন-ঘর পরিষ্কার করাইতে গিয়া রমণী বাবু তাঁহার প্রদত্ত সুন্দর কৌটাটি পাইলেন; শুধু তাহাই নহে, কৌটা খুলিয়া দেখিলেন, তন্মধ্যস্থ বটিকাটিও রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া তিনি একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তবে ত তাঁহার সকল আয়োজনই পণ্ড হইয়াছে; বুড়ী খুন হয় নাই, রোগের যন্ত্রণায় বা বয়সের গতিকে স্বাভাবিক ভাবেই মরিয়াছে। সুতরাং তাঁহার ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে আশঙ্কা আবার প্রবল হইল, খুনের ভবিতব্যতা ত খণ্ডাইল না। খানিক দম ধরিয়া থাকিয়া আবার তিনি নবোৎসাহে অন্য শীকারের চেষ্টায় মাথা ঘামাইতে লাগিলেন।

অনেক চিন্তার পর তাঁহার স্মরণ হইল যে, তাঁহার পিতার মাতামহ অত্যন্ত স্থবির হইয়া পড়িয়াছেন, অথচ মার্কণ্ডেয়ের পরমায়ুঃ লইয়া বিরাজ করিতেছেন। শৈশবে পঠিত কবিতাংশও তাঁহার মনে পড়িল,—'অশীতিপরের বটে মরণ মঙ্গল।' বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার একটি বাতিক ছিল,

বোধ হয়, এই বাতিকেই তাঁহাকে জীয়াইয়া রাখিয়াছিল; অসংখ্য ঘড়ী তাঁহার প্রশস্ত বৈঠকখানায় জমিয়াছিল, নূতন রকমের ঘড়ীর সন্ধান পাইলেই তিনি কিনিতেন, আর নিয়মিতরূপে ঘড়ীগুলিতে স্বহস্তে দম দেওয়া তাঁহার নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতির একটি অঙ্গ ছিল। রমণী বাবু এই রন্ধ্র দিয়া তাঁহার শনি হইয়া প্রবেশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

সেই সময়ে বাঙ্গালা দেশে বোমার ব্যাপারে হুলস্থূল লাগিয়াছে। রমণী বাবুর মাথায় এই বুদ্ধি যোগাইল, ঘড়ীর ভিতর কৌশলে এমন ভাবে বোমা রাখা হইবে যে ঘড়ীতে দম দিতে গেলেই বোমা ফাটিয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটাইবে। বোমাওয়ালাদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে না হইলেও পরোক্ষভাবে জানাশুনা ছিল। তিনি অতি গোপনে মধ্যবর্ত্তীর মারফত উক্ত দলের এক জন মাতব্বরের কাছে এইরূপ একটি ঘড়ীর ফরমায়েস পাঠাইলেন। বোমাওয়ালা এরূপ এক জন ধনী, মানী ও বিদ্বান্ লোককে এই সূত্রে হাতে রাখিতে পারিলে ভবিষ্যতে অনেক উপকার পাইবে, সেই আশায় খুব উৎসাহের সহিত ঘড়ী সত্বর প্রস্তুত করিয়া দিল।

ঘড়ী লইয়া রমণী বাবু হাসিমুখে বৃদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন ও কুশলপ্রশ্নান্তে ঘড়ীটি তাঁহার হস্তে দিলেন।

ঘড়ীর কারুকার্য্য দেখিয়া বৃদ্ধ খুসী হইলেন এবং ঘড়ীটির মূল্য জানিতে চাহিলেন। রমণী বাবু যখন বলিলেন "ইহার মূল্য লাগিবে না, আমি এটি আপনাকে ভক্তি-উপহার দিলাম," তখন তিনি প্রাণ খুলিয়া দৌহিত্রপুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রমণী বাবুর মনোগত অভিপ্রায় জানিলে বৃদ্ধ যে তাঁহাকে উচ্ছ্বসিত আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে কঠোর অভিশাপ দিতেন, তাহা বলা বাহুল্য!

সেই অবধি রমণী বাবু পর পর কয় দিন বৃদ্ধের বাড়ীতে হাজিরা দিতে লাগিলেন, বুড়া কোন্ দিন ঘড়ীটিতে দম দিতে গিয়া নিজে বেদম হইয়া যান, তাহার সংবাদ রাখিবার জন্য। কিন্তু এবারও তাঁহার আশাভঙ্গ হইল। বৃদ্ধ এক দিন রমণী বাবু আসিবামাত্র বলিলেন, "তুমি দেখছি ঘড়ীর আসল মজাটুকুই আমার কাছে প্রকাশ কর নি,—বোধ হয়, আমাকে হঠাৎ তাক লাগা'বার মতলবে।" রমণী বাবু কম্পিতবক্ষে অথচ কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলুন ত?" বৃদ্ধ সকৌতুকে বলিলেন, "দম দিতে গেলেই ঘড়ীতে এক তাজ্জব ব্যাপার ঘটে, যেন সার্ সার্ পট্‌কাতে কে আগুন লাগিয়েছে, চটাপট শব্দ দশ মিনিট ধ'রে চল্‌তে থাকে।" কথা শুনিয়া রমণী বাবু

একেবারে আক্কেল গুড়ুম হইলেন। তিনি বেশ বুঝিলেন, তাঁহার কপালের দোষে বা বুড়োর বরাতের জোরে সাজ্ঘাতিক বোমা ছেলেখেলার পটকায় পরিণত হইয়াছে। তিনি মনে মনে আনাড়ী বোমাওয়ালাকে ও বাহাত্তুরে বুড়াকে জাহান্নামে পাঠাইয়া, কোনও প্রকারে ঢোক গিলিয়া কষ্টহাসি হাসিয়া জরুরী কাযের অছিলায় বুড়ার কাছ হইতে বিদায় লইয়া সরিয়া পড়িলেন।

দুই দুই বার বড় আশায় বঞ্চিত হইয়া রমণী বাবু একেবারে মুষড়িয়া গেলেন। ওদিকে নানা অজুহাতে, মামলা মুলতবী করার মত, বিবাহ স্থগিত করার জন্য কন্যাকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তার আত্মীয়-স্বজনগণ খুবই বিরক্ত হইতেছিলেন। অনেক শুভানুধ্যায়ী, কন্যার পিতাকে লুব্ধ আশ্বাসে বসিয়া না থাকিয়া, কালবিলম্ব না করিয়া বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যার অন্যত্র বিবাহের চেষ্টা দেখিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু এমন সুপাত্রের আশা একেবারে ত্যাগ করিতে মন সরে না বলিয়া কন্যার পিতা সে কথা বড় গায়ে মাখিলেন না।

এদিকে রমণী বাবুর মনের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার বড় আশা ছিল, জ্যোতিষী গণনার একটা কিনারা করিয়া তিনি নিশ্চিন্তমনে মনোরমা পত্নী বিবাহ করিয়া জীবনের সার-সুখ অনুভব করিবেন, কিন্তু এত দিনে 'সে আশা হইল দূর।' দুই দুই বার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তিনি একেবারে হা'ল ছাড়িয়া দিলেন। নৈরাশ্যে তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া গেল। সর্ব্বদাই একা একা থাকেন, বিমর্ষভাবে কাল কাটান, আমোদ-প্রমোদ দূরে থাকুক, আহার-নিদ্রায়ও কোনও সুখ পান না। কি করিবেন, কি করিলে হৃদয়ের শূন্যতা দূর হয়, একটু শান্তিলাভ হয়, তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কখনও ভাবেন, সব ছাড়িয়া ছুড়িয়া দিয়া বিবাগী হইয়া একদিকে বাহির হইয়া যান, দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ান ; কখনও ভাবেন, আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা জুড়ান। কোন মীমাংসায়ই আসিতে পারিলেন না।

মনের এইরূপ অবস্থায় তিনি একদিন সন্ধ্যাকাল হইতে খানিক রাত্রি পর্য্যন্ত অন্যমনস্কভাবে হাওড়ার পুলের উপর দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময়ে হঠাৎ তাঁহার নজর পড়িল, জ্যোতিষী অদূরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন ; তিনিও কেমন

করোনারের বিচারালয়ে সাব্যস্ত হইল, একজন অজ্ঞাত-পরিচয় ব্যক্তির নদীতে পতনে আকস্মিক মৃত্যু। জুরীর রায়ে খুনের সন্দেহমাত্র ছিল না। তখন রমণী বাবু 'রাম বল, বাঁচা গেল' বলিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন এবং মহোৎসাহে বিবাহোৎসবের ব্যবস্থা করিতে লাগিয়া গেলেন। বিবাহের রোশনাই ও মিছিল, ব্যাণ্ড ও ব্যাগপাইপের বাজনা, রোশনচৌকীর মধুর-আলাপ, ভূরিভোজন ও প্রীতি-উপহার, স্ত্রী-আচার ও বাসর-ঘর প্রভৃতির সরস-বিবরণ দিয়া পুঁথি বাড়াইব না।

ইহার পর যদি কখনও কথা-প্রসঙ্গে কেহ রমণী বাবুকে জিজ্ঞাসা করিত, আপনি ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন কি না, তিনি মৃদু হাসিয়া বলিতেন, "বিলক্ষণ বিশ্বাস করি। আমার জীবনে জ্যোতিষী গণনা অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়াছে, তাহারই ফলে আমি নিরবচ্ছিন্ন দাম্পত্য-সুখ ভোগ করিতেছি।" *

---

* একটি ইংরেজী গল্পের অনুসরণে লিখিত।

স্বপ্নাদ্য মাদুলি

(১)

সোণাডাঙ্গার স্বর্গভুবন-তুল্য জমিদার ভবন আজ নিরানন্দ। চাকর-দাসী, আমলা-ফায়লা, আত্মীয়-স্বজন, সকলেই আজ শোকাচ্ছন্ন। জমিদার শ্রীল শ্রীযুক্ত রমাকান্ত রায় মহাশয় মূর্চ্ছিত। তাঁহার সর্ব্বসুখের আধার, আনন্দ-নির্ঝর, সুরূপা সুশীলা পত্নীর আজ জীবনান্ত ঘটিয়াছে। সেই সুবর্ণ-প্রতিমা আজ নিস্পন্দ-ভাবে শয্যায় পড়িয়া আছে।

শোকের বেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে, দেওয়ান লোক-জন ঠিক করিয়া মৃতদেহ সৎকারার্থ গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। পত্নীবিয়োগবিধুর রমাকান্ত বাবু তখন মূর্চ্ছাভঙ্গে মৃতদেহের পার্শ্বে নিশ্চল, নিস্তব্ধ, মূক, পাষাণ-মূর্ত্তিবৎ উপবিষ্ট। দেওয়ান গলদশ্রুলোচনে তাঁহার হাত ধরিয়া কক্ষান্তর লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন, লোকজন সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া মৃতদেহ বহন

করিবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিল। রমাকান্ত বাবু একবার সকলের মুখ-পানে চাহিয়া হঠাৎ যেন চমকাইয়া উঠিলেন; তাহার পর দুই বাহু দিয়া প্রিয়তমার দেহ আগুলিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আমি কিছুতেই এ দেহ উঠাইতে দিব না।" দেওয়ানজি, পুরোহিত ঠাকুর ও দুই একজন প্রবীণ আত্মীয় তাঁহাকে বিস্তর বুঝাইলেন; কিন্তু তিনি অটল ভাবে সেই দেহ ধরিয়া রহিলেন। কাহার সাধ্য তাঁহার বাহু-পাশ হইতে তাহা ছিনাইয়া লয়? বিশেষতঃ তাঁহার তখনকার উন্মত্তের মত মূর্ত্তি দেখিলে অতিসাহসিকেরও হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয়।

এই ভাবে অর্দ্ধদণ্ড কাল কাটিল। তাহার পর পুরোহিত ঠাকুর ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া আস্তে আস্তে রমাকান্ত বাবুর পার্শ্বে মৃতদেহের সম্মুখীন হইয়া বসিলেন। দৈবাৎ তাঁহার নজরে পড়িল যে মৃতদেহের বাম বাহুতে একটি সুবর্ণ-মাদুলি রহিয়াছে। এই মাদুলিটির ইতিহাস গৃহিণীর প্রমুখাৎ তিনি শ্রুত ছিলেন। রমাকান্ত বাবু বিবাহের পর হইতেই পত্নীর এরূপ অনুরাগী ছিলেন না। এমন কি, যৌবনে বিলাসী জমিদার বাবু রাত্রে গৃহে থাকিতেন না, এমন দিনও গিয়াছে। তাহার পর,

জমিদার-গৃহিণী একটি স্বপ্নাদ্য মাদুলি ধারণ করিয়া স্বামীর প্রণয় আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। সেই অবধি স্বামী আর কখনও তাঁহার আঁচল-ছাড়া হয়েন নাই। পুরোহিত ঠাকুর বুঝিলেন, এ সেই মাদুলি। ইহাতে ভবিষ্যতে অপর কাহারও উপকার দর্শিতে পারে, এই ভাবিয়া পুরোহিত ঠাকুর অতি-সন্তর্পণে ঘুনসী-সহ মাদুলিটি খুলিয়া লইয়া আপাততঃ সেটি নিজের দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করিলেন এবং একজন বর্ষীয়সীকে অবশিষ্ট স্বর্ণালঙ্কারগুলি খুলিয়া লইতে ইঙ্গিত করিলেন। ইহার পরেই রমাকান্ত বাবুকে যেন শান্ত দেখা গেল। এবার একবার-মাত্র অনুরোধে তিনি পুরোহিত ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে কক্ষান্তরে গেলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে গঙ্গাতীরে গিয়া যথাশাস্ত্র অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সমাধা করিতেও আপত্তি করিলেন না। তাহার পরে গঙ্গাস্নানান্তে তিনি পুরোহিত ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে গৃহে ফিরিলেন।

আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি শোকে যেরূপ মুহ্যমান হইবেন বলিয়া সকলে আশঙ্কা করিয়াছিল, সেরূপ দেখা গেল না। সকলে ইহা পুরোহিত ঠাকুরের জ্ঞান গর্ভ সান্ত্বনা-বাক্য ও উপদেশের ফল বলিয়াই বুঝিলেন।

(২)

পরদিন হইতেই কিন্তু রমাকান্ত বাবুর ইহা অপেক্ষাও বিস্ময়জনক পরিবর্ত্তন সকলে লক্ষ্য করিল। তিনি কর্ম্মচারী-দিগের বা আত্মীয়বর্গের কথা ভাল করিয়া শুনেন না, দেওয়ানকে নিতান্ত অবহেলা করেন, কিন্তু পুরোহিত ঠাকুরকে সর্ব্বদা নিকটে রাখিতে চাহেন এবং তাঁহার সঙ্গেই সাংসারিক ও জমিদারি-সংক্রান্ত সকল কথার আলোচনা করেন। শেষে একদিন দেওয়ান কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে আদেশ পাইলেন এবং তৎপদে ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ পুরোহিত ঠাকুর নিযুক্ত হইলেন!

পুরোহিত ঠাকুর এই উচ্চপদ লাভ করিবার জন্য কোনও রূপ কৌশল অবলম্বন করেন নাই, এরূপ উচ্চাভিলাষ তাঁহার কোনও দিন ছিল না। তবে তিনি প্রতিপালক যজমানের অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়াই অগত্যা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং অন্যান্য কর্ম্মচারিগণের পরামর্শ লইয়া জমিদারির কার্য্য চালাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ভূতপূর্ব্ব দেওয়ানের মোটা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া কাশীবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

কিছুদিন এই ভাবে কার্য্য চলিতে লাগিল। কিন্তু সাত্ত্বিক-প্রকৃতি ব্রাহ্মণ যতই জমিদারি-কার্য্যের ভিতর প্রবেশ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার এ বিষয়ে বিতৃষ্ণা জন্মিতে লাগিল। প্রজা-পীড়ন, উৎকোচ-গ্রহণ, কূট-কৌশল প্রভৃতি তাঁহার নিতান্তই প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। তিনি প্রায়ই মনিবের নিকট কার্য্যত্যাগের ইচ্ছা জানাই-তেন, কিন্তু মনিব সে কথায় কর্ণপাত করিতেন না। পরন্তু সর্ব্বদাই তাঁহাকে কাছে কাছে রাখিতে চাহিতেন বলিয়া ব্রাহ্মণের নিত্যকৃত্যের অনেক ব্যাঘাত হইত। তিনি কি উপায়ে এই কর্ম্মভোগ হইতে নিষ্কৃতি পান, কিছুই স্থির করিতে পারিতেন না।

এই ভাবে কয়েক মাস গেল। জমিদার-গৃহিণীর স্বপ্নাদ্য মাদুলিটা পুরোহিত ঠাকুর সেই যে খুলিয়া লইয়া নিজের বাহুতে ধারণ করিয়াছিলেন, তদবধি তাহা আর অন্যত্র রাখিবার কথা তাঁহার মনে পড়ে নাই। কিন্তু একদিন ঘুনসী পচিয়া যাওয়াতে মাদুলিটি পড়িয়া গেল। পুরোহিত ঠাকুর সেটি কুড়াইয়া লইয়া যে কুলুঙ্গিতে তাঁহার জপের মালা প্রভৃতি থাকিত, সেইখানে রাখিলেন।

পরদিন তিনি যখন জমিদার-বাড়ী গেলেন, তখন

তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, রমাকান্ত বাবু আর তাঁহার প্রতি পূর্ব্বের মত অনুগত-ভাব দেখাইলেন না, তেমন আগ্রহের সহিত তাঁহার কথা শুনিলেন না বা তাঁহার সঙ্গলাভ করিবার চেষ্টা করিলেন না। ইহাতে পুরোহিত ঠাকুর বিস্মিত হইলেন, কিন্তু ক্ষুণ্ণ হইলেন না। মনিবের নিকট তিনি যে অতিরিক্ত আদর পাইতেন, তাহা তাঁহার ভাল লাগিত না। এখন যেন তিনি একটু স্বস্তি বোধ করিলেন। এই ভাবে দু'-চার দিন গেলে তিনি আবার কর্ম্মত্যাগের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। এবার তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। তিনি সাবেক দেওয়ানকে কাশীধাম হইতে আনাইয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং এতদিনের পর হাঁফ ছাড়িয়া আবার চিরাভ্যস্ত পূজাহ্নিক-প্রভৃতিতে অধিক সময় ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন।

(৩)

কিন্তু বেশী দিন না যাইতেই পুরোহিত ঠাকুরের আর এক অশান্তির কারণ উপস্থিত হইল। প্রৌঢ় রমাকান্ত বাবু হঠাৎ একদিন পুরোহিত ঠাকুরের বালিকা কন্যা অলকাকে বিবাহ করিবার জন্য উপযাচক হইলেন! ব্রাহ্মণ ত প্রস্তাব

শুনিয়া একেবারে স্তম্ভিত ; পঞ্চাশদ্‌বর্ষীয় জমিদারের নিকট বালিকা কন্যাকে বলি দিয়া খুব একটা দাঁও মারিতে বিষয়-বুদ্ধি-সম্পন্ন অনেকে হয় ত খুবই রাজি হইত ; কিন্তু পুরোহিত ঠাকুর সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। এ দিকে রমাকান্ত বাবু ক্রমেই বেশ একটু পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। পুরোহিত ঠাকুর কি উপায়ে প্রবলপ্রতাপ জমিদার মহাশয়কে প্রত্যাখ্যান করিবেন অথচ তাঁহার ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূত হইবেন না, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্ত হইয়া পড়িলেন।

একদিন জমিদার-বাটী হইতে ঐ প্রস্তাব-সম্বন্ধে অপ্রিয় আলোচনা করিয়া পুরোহিত ঠাকুর গৃহে ফিরিতেই দেখিলেন, কন্যা অলকা তাহার শিশু ভ্রাতাকে কোলে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, শিশুটি দিদির বাহুসংলগ্ন একগাছি ঘুনসি ধরিয়া টানাটনি করিতেছে, কিছুতেই ছাড়িতেছে না। এই দৃশ্য-দর্শনে তাঁহার মনে একটা খটকা, একটা আশঙ্কা জাগিল। তিনি কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর হাতে ওটা কি খোকা টানাটানি করছে ?" কন্যা হাসিতে হাসিতে বলিল, "বাবা, ও একটা মাদুলি।" "কোথায় পেলি ?" এই প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল, "কুলুঙ্গির নীচে মাটিতে প'ড়ে

পেয়েছি।” পিতা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “এটা কবে থেকে ধারণ করেছিস?” কন্যা বলিল, “এই দিন দশেক হ’ল।” তিনি চিনিলেন, এ সেই জমিদার-গৃহিণীর স্বপ্নাদ্য মাদুলি। অলকা সেটি কুড়াইয়া পাইয়া কোথা হইতে এক-গাছি ঘুনসি সংগ্রহ করিয়া ছেলেমানুষি-খেয়ালে উহা ধারণ করিয়াছে, আর সেই দিন হইতেই পত্নীবৎসল রমাকান্ত বাবুর অলকার উপর নজর পড়িয়াছে, তাহাকে পূর্ব্ব-পত্নীর স্থলাভি-ষিক্তা করিতে মন গিয়াছে, এই কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ এখন তিনি যেন নখদর্পণে দেখিলেন। তিনি কন্যাকে ‘ঠাকুরদের জিনিস, হাতে দিতে নেই’ বলিয়া মৃদু ভৎসনা করিয়া অবিলম্বে মাদুলিটি কন্যার বাহু হইতে খুলিয়া লইলেন এবং শীঘ্রই এটিকে গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দিবেন সঙ্কল্প করিয়া আপাততঃ গুপ্তস্থানে রাখিয়া দিলেন।

বলা বাহুল্য, তাহার পর হইতে রমাকান্ত বাবু আর বিবাহ-সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না। পুরোহিত ঠাকুর এই পরিবর্ত্তনের নিগূঢ় কারণ বুঝিয়া মনে-মনে হাসিলেন।

(৪)

ইহার পরে একদিন প্রত্যূষে পুরোহিত ঠাকুর মাদুলিটি গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দিবার অভিপ্রায়ে গঙ্গাস্নানে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে ঘটনাচক্রে তাঁহার রমাকান্ত বাবুর সহিত দেখা হইল, রমাকান্ত বাবু তখন প্রাতভ্রর্মণে বাহির হইয়াছেন। 'ভট্টাচার্য্য মহাশয় কোথায় যাইতেছেন', 'অনেক দিন গঙ্গাদর্শন হয় নাই, তাই যাইতেছি'—এইরূপ কথোপকথনের পর রমাকান্ত বাবু বলিলেন 'চলুন, আমিও যাইব', এই বলিয়া তিনি পুরোহিত ঠাকুরের অনুগমন করিলেন। পুরোহিত ঠাকুর একটু বিপন্ন হইলেন, কিন্তু সঙ্গীর অজ্ঞাতে মাদুলীটির গতি করিতে পারিবেন, মনকে এইরূপ প্রবোধ দিয়া অগত্যা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সঙ্গত আপত্তি করিবারও ত কিছু ছিল না।

যথাকালে গঙ্গাতীরে পৌঁছিয়া উভয়ে গঙ্গাগর্ভে অবতরণ করিলেন। পুরোহিত ঠাকুর ভক্তিভরে তিনটি ডুব দিলেন এবং তৃতীয় ডুবে মাদুলিটি গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিলেন। এত দিনে মাদুলির জড় মরিল ভাবিয়া তিনি মনে-মনে তৃপ্তি

অনুভব করিলেন এবং গঙ্গাস্তব-পাঠ, সন্ধ্যা-আহ্নিক প্রভৃতি সমাধা করিয়া তীরে উঠিলেন।

রমাকান্ত বাবুর কিন্তু গঙ্গাগর্ভ হইতে উঠিবার কোনও তাড়া দেখা গেল না। তিনি বারবার ডুব দিতে লাগিলেন। বড়-মানুষের সুখী শরীর, অধিকক্ষণ জলে পড়িয়া থাকিলে ও অধিক ডুব দিলে শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িবে, পুনঃ পুনঃ এই অনুযোগ করিয়া পুরোহিত ঠাকুর কোনও প্রকারে তাঁহাকে তীরে তুলিলেন। কিন্তু পুরোহিত ঠাকুর যখন গৃহে ফিরিবার উদ্‌যোগ করিলেন, তখন রমাকান্ত বাবু একেবারে বাকিয়া বসিলেন। তিনি গঙ্গাতীরে বাস করিবেন, সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া এক পাও অগ্রসর হইবেন না, এই অভিমত প্রকাশ করিলেন। তাঁহাকে টলান দুঃসাধ্য ব্যাপার বুঝিয়া পুরোহিত ঠাকুর ক্ষুণ্ণমনে একাকী স্বগৃহে ফিরিলেন এবং দেওয়ানজিকে সংবাদ দিলেন।

দেওয়ানজি সদলবলে প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া বহু সাধ্যসাধনা করিলেন, কিন্তু তিনিও প্রভুকে এই সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। উপায়ান্তর না দেখিয়া তখনকার মত একটি দোকানে প্রভুর বসবাসের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া দেওয়ানজি তাঁহার হুকুমে তথায় গঙ্গাবাসের

উপযোগী গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য লোক-জন লাগাইলেন। যত দিন গৃহ প্রস্তুত না হইল, জমিদার মহাশয় সেই দোকানেই নির্ব্বিকার-চিত্তে বাস করিতে লাগিলেন। পরে গৃহ প্রস্তুত হইলে পুরোহিত ঠাকুরকে দিয়া শুভদিন দেখাইয়া তিনি গৃহপ্রবেশ করিলেন। তদবধি তিনি যে কয় বৎসর জীবিত ছিলেন সে কয় বৎসর কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্তভাবে গঙ্গাজলে অবগাহন করিতেন বা গঙ্গাতীরে পরিভ্রমণ করিতেন। অনেক চেষ্টায় তাঁহাকে আহারাদি ব্যাপারে প্রবৃত্ত করিতে হইত। শেষে একদিন গভীর রাত্রে তিনি রক্ষিবর্গের সতর্ক পাহারা কোনও প্রকারে এড়াইয়া গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সকল জ্বালা জুড়াইলেন। যে হারানিধির অন্বেষণে তিনি এরূপ 'উদ্‌বিগ্নচিত্ত পরিখেদিতমনাঃ' হইয়া এই দীর্ঘ কয় বৎসর কাটাইয়াছিলেন, কে জানে জীবনান্তে তাঁহার সে নিধি মিলিয়াছিল কি না? *

---

* একটি ইয়োরোপীয় কিংবদন্তী-অবলম্বনে লিখিত।

শিবনাথ

মাতঙ্গী

অনুচ্চ কিন্তু আবেগপূর্ণ কণ্ঠে স্বামী শিবনাথ বলিলেন,—"মাতু, তুমি যে বড়ই বাড়াবাড়ি ক'রে তুল্‌লে, শেষে একদিন একটা কেলেঙ্কারী না ক'রে আর তুমি ছাড়বে না দেখ্‌ছি। ক্ষান্ত দাও, আর মিছেমিছে কথা কাটাকাটি ক'রো না। জানই তো কথায় কথা বাড়ে।"

স্ত্রী মাতঙ্গী ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"কেলেঙ্কারীটা আবার কিসে হ'বে? ঘরের ভেতর রাত্তিরকালে তোমাকে দুটো কথা বল্‌বো, তা'র আর ঢাকা রাখা কি? আমি তো অন্যায় কথা কিছু বল্‌ছিনে। তুমি বছরে দুবার ক'রে দুদিন তিনদিন ধ'রে ডুব দাও, জিজ্ঞেস করলে কোন কথা ভাঙ্গো না। এর একটা জবাবদিহি চাই-ই চাই। নেশা ক'রে কোথায় প'ড়ে থাক, বল দেখি।"

স্বামী পূর্ব্বের মত অনুচ্চস্বরে বলিলেন,—"ছিঃ মাতু,

আমাকে কি নেশাখোরের মত দেখায় ? আর নেশাখোর কি ছমাস চুপ ক'রে থেকে একদিন নেশা ক'রে দুদিন বেহুঁস হয়ে প'ড়ে থাকে ? যাক্ আমি যেখানে যাই, সে খোঁজে তোমার প্রয়োজন কি ? কৈ শ্বশুর মহাশয় তো কোনদিন তা'র জন্যে কৈফেৎ চাননি ? মেয়েমানুষের অত কথা জেনে কি লাভ ?"

মাতঙ্গী চড়া গলায় বলিলেন—"হাঁ বাবার তো খেয়ে দেয়ে কায নেই, তাই জমিদারীর ভাবনা ভুলে' তুমি কি কর কোথায় যাও তা'র খবর রাখ্‌বেন, তুমি তো তাঁর মাহালের নায়েব গোমস্তা নও। সে ভার আমার।"

স্বামী এবারও নরমস্বরে বলিলেন,—"মাতু, ক্ষমা দাও, আর অনেক রাত্তির হয়েছে, এখন একটু ঘুমুতে দাও।"

পত্নী ঝাঁকিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"কি বারে বারে মাতু মাতু করছ, আমি কি তোমার ছোট বোন না দাসীবাঁদী?"

স্বামী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"তবে কি বল্‌ব ? গিন্নী মশায়, মনিব ঠাকুরুণ না হুজুর !"

পত্নী ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বলিলেন,—"নাও, ঠাট্টা রাখ,

ঠাট্টা ক'রে আসল কথা চাপা দিলে চল্‌বে না। তুমি কোথায় যাও না জান্‌লে আমি ছাড়ছিনে।"

এই বলিয়া মাতঙ্গী উঠিয়া বসিলেন,—এতক্ষণ পালঙ্কে অর্দ্ধশয়ানাবস্থায় ছিলেন। রাগে চোখ-মুখ লাল হইয়াছে, স্বর উচ্চে উঠিয়াছে।

শিবনাথ গম্ভীর-ভাবে বলিলেন,—"বাপরে, তুমি যে দেখ্‌ছি একেবারে গুরুমশায় সেজে বস্‌লে। আমি যদি না বলি, তুমি কি কর্‌বে?"

মাতঙ্গী তখন একেবারে রাগে জ্ঞান হারাইয়াছেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে বলিলেন,—"বলবে না, তোমার এত বড় আস্পর্দ্ধা! একি তোমার বাবার বাড়ী পেয়েছ? এ আমার বাবার বাড়ী, এখানে আমি যা বল্‌ব তাই শুন্‌তে হবে।"

শিবনাথ গাঢ়স্বরে বলিলেন, "ছি বাপ তুলো না। এ কি ছেলেমানুষি?"

মাতঙ্গী বিকৃতস্বরে বলিলেন,—"ওমা গেছি গো! বাপের তো বড় দরদ! তা' বছর অন্তর একটু জলপিণ্ডিও তো দেওয়া হয় না।"

শিবনাথ বলিলেন,—"আমার কর্ত্তব্য করি কি না তা'র জবাবদিহি তো তোমার কাছে দিতে হ'বে না। আমার

বাবার কায তো তোমার বাবার ভিটেয় ব'সে করতে পারিনে। করতে হ'লে সে নিজের বাপের ভিটেয় ব'সেই করতে হয়। বাপ-মায়ের কায করতেই যে আমি সে ভিটেয় যাইনে, তা' তুমি কিসে বুঝ্‌লে ?"

মাতঙ্গী তখন কথাটা পাল্টাইয়া লইয়া বলিলেন,—"তা' সে ভিটেয় যদি এত মায়া তো সেখানে মাটি কাম্‌ড়ে প'ড়ে থাক্‌লেই হয়। এখানে জ্বালাতে আস কেন ?"

শিবনাথ উত্তর করিলেন,—"সেও পিতৃদেবের সত্যরক্ষার জন্য। তিনি যে আমাকে ঘরজামাই করবার ব্যবস্থা ক'রে গেছেন। তা' নইলে আর এই অপমান সই ?" এই বলিয়া শিবনাথ গদ্‌গদ-কণ্ঠে আবৃত্তি করিলেন,—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

মাতঙ্গী ইহাতেও নরম না হইয়া তেম্‌নি গরমভাবেই বলিলেন,—"তা, এখন না হয় বাপের কাছে গিয়ে বন্দোবস্তটা খারিজ করিয়ে আন। আমারও জ্বালা জুড়োয়, তুমিও নিশ্চিন্দি হও।"

এই শেষ কয় ফোঁটা মধুবর্ষণ করিয়া ধনি-কন্যা স্থূলাঙ্গী মাতঙ্গী ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পড়িলেন।

শিবনাথ একবার ভাবিলেন, এই অপমানের পর তখনই গৃহত্যাগ করেন, কিন্তু 'জামাইবারিকে'র অভয়ের মত দুপুররাত্রে একটা সোরগোল না করিয়া কৌচের উপর হেলান দিয়া চক্ষুঃ বুঁজিয়া পড়িয়া থাকিলেন। শৈশবে স্বর্গগতা মাতার কথা, পিতার স্নেহের কথা, দারিদ্র্যের কথা, অনেক কথাই মনে পড়িল। পত্নীর গর্ব্বিত ব্যবহার অনেক দিন হইতেই তাঁহার মনে বিঁধিতেছিল, তবে এতটা অপমান আর কোনদিন ঘটে নাই। ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিতে বিনিদ্র অবস্থায় রাত্রিটা কাটাইলেন। ভোরে চাকর-দাসীর কলরব শুনিবামাত্র নিদ্রিত শিশুপুত্র সুকুমারের কচি মুখখানি একবার দেখিয়া লইয়া প্রাতভ্রমণের বেশে গৃহত্যাগ করিলেন। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস আর দু'ফোটা চোখের জল তাঁহার হৃদয়-বেদনার সাক্ষী রহিল।

পুরুষস্য ভাগ্যম্

শিবনাথ দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। শৈশবে মাতৃহারা শিশুকে লইয়া তাঁহার দরিদ্র পিতা বড়ই বিপন্ন হইয়াছিলেন। প্রতিবেশীদিগের সাহায্যে কোনও প্রকারে শিশুটীর রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালককে রামনগরের

জমিদার মহাশয়ের সবিশেষ অনুরোধে তাঁহার ঘরজামাই রাখিতে দিতে সম্মত হইলেন। দরিদ্র পিতা শুধু সন্তানের ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই এই কার্য্য করিলেন, এক পয়সাও গ্রহণ করিলেন না। বৈবাহিক মহাশয় মাসহারা দিতে চাহিলেও তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন,—"আপনি যাহা ইচ্ছা জামাতাকে দিতে পারেন। আমি কিছু লইব না। আমি তো পুত্র বিক্রয় করিতেছি না, উৎকোচও লইতেছি না।" সেই অবধি জমিদার মহাশয় জামাতাকে আলাদা মাসহারা কন্যাকে আলাদা মাসহারা দিয়া আসিতেছেন। বিবাহের কয়েক বৎসর পরে শিবনাথের পিতৃবিয়োগ হইল। যতদিন পিতা বাঁচিয়াছিলেন, শিবনাথ বৎসরে দুইবার করিয়া পিতৃচরণ দর্শন করিতে যাইতেন। জমিদার মহাশয় তাহাতে প্রসন্নচিত্তে সম্মতি দিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরেও যে শিবনাথ পিতার ও মাতার একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের উপলক্ষে পৈত্রিক ভিটায় যাইতেন, জমিদার মহাশয় অত খবর রাখিতেন না, তবে রাখিলেও নিশ্চয়ই আপত্তি করিতেন না।

এক্ষণে শিবনাথ পত্নীর ব্যবহারে বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন, আত্মধিক্কারে তাঁহার মন পরিপূর্ণ হইল। তাই তিনি

নবজাত আত্মজের মায়া কাটাইয়া, ও শ্বশুর মহাশয়কে এই লজ্জাকর ব্যাপার না জানাইয়া শ্বশুরের ভিটা ত্যাগ করিলেন। বাৎসরিক শ্রাদ্ধাদির পরও হাতে কিছু টাকা ছিল। একবার ভাবিলেন, এই ঘরের টাকা আর নিজের প্রয়োজনে খরচ করিবেন না। তাহার পর বুঝিলেন যে, শ্বশুর মহাশয় তো কখন অপমান করেন নাই, আর ইহার পরেও তো সেখানকার টাকা তিনি স্পর্শ করিবেন না। অতএব বাকী কয়টা টাকা খরচ করিতে দোষ কি? এই কয়টা টাকা লইয়া তিনি 'পশ্চিম' যাত্রা করিলেন; পঠদ্দশায় যে অল্প বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহারই জোরে পশ্চিমে একটা চাকরীর যোগাড় করিতে পারিবেন এই আশায় বুক বাঁধিলেন। স্ত্রী-পুত্রের ভাবনা নাই, একটা পেট একরকমে চলিবেই। সাধারণতঃ বড়মানুষের ঘরজামাই হইলে অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত যুবকেরা যেরূপ অধঃপাতে যায়, শিবনাথের সেরূপ হয় নাই। তাঁহার বিদ্যা বেশী না থাকিলেও পিতৃপুণ্যবলে চরিত্র নির্ম্মল ছিল।

সে-বারে রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগের ধর্ম্মঘট, মহা হুলস্থূল লাগিয়াছে, সকল ট্রেণই এসেনসোলে আটকাইয়া যাইতেছে। সহস্র সহস্র যাত্রী সেই অপরিচিত স্থানে

পড়িয়া থাকিতেছে। তবে স্থানীয় ভদ্রলোকদিগের আতিথ্যে ও সৌজন্যে যাত্রীদিগের কষ্টের অনেক লাঘব হইয়াছিল। শিবনাথ এই যাত্রীদিগের মধ্যে ছিলেন। ঘটনাক্রমে তিনি তাঁহার একজন বাল্যবন্ধু মতিলালকে এখানে পাইলেন। মতিলাল এক্ষণে এসেন-সোলে স্থায়ী হইয়াছেন, কয়লার খনি কিনিয়া বড়মানুষ হইয়াছেন। শিবনাথকে পাইয়া মতিলাল বড় আহ্লাদিত হইলেন। আহার ও বিশ্রামের পর শিবনাথ তাঁহাকে অকপটে সকল কথা বলিলে, মতিলাল বলিলেন,—"শিবু দা, ছেলেবেলা হ'তে তোমাকে বুদ্ধিমান্ ও সৎস্বভাব ব'লে জানি। আমার এই ব্যবসায় একজন বিশ্বাসী ম্যানেজারের দরকার। মাহিনা-করা লোক দিয়া ঠিক এ কায হয় না। তুমি যদি রাজী থাক, তোমাকে এই কায দিই। আপাতক তোমার যখন যা দরকার আমার কাছ থেকে পাবে, আমার বাড়ীতেই থাক্‌বে। ব্যবসায় শূন্য বখ্‌রাদার হ'য়ে তুমি কাজ আরম্ভ কর, তা'রপর যদি উন্নতি দেখাতে পার, তোমাকে লাভের একটা বখ্‌রা দেব। চাকর-মনিব সম্পর্ক আমাদের মধ্যে রইল না। আমরা যেন সেই ছেলেবেলাকার মত ভাই-ভাই।" শিবনাথ বাল্যবন্ধুর

মতিলালের স্বতন্ত্র বাসা করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নিঃসন্তানা শ্যালকপত্নী মতিলালের ছেলে-মেয়েদের কাছে পাইয়া কিছুতেই ছাড়িয়া দিতে রাজী হইলেন না। মতিলালের গৃহিণীও দাদা ও বৌ-দিদিকে ছাড়িয়া অন্য বাসায় যাইতে নারাজ। বলিলেন,—"তবে আর এখানে এলাম কেন? সেই কয়লার গুদামে থাক্‌লেই হ'ত।" একটু অভিমান করিয়া অনুনাসিক স্বরে বলিলেন,—"তোমার এখানে না পোষায়, তুমি না হয় বন্ধুকে নিয়ে দু'জনে আলাদা বাসা ক'রে থাকগে। আমি কিন্তু তোমাদের দেখা-শুনোও কর্‌তে পার্‌বনা না, চাকর বামুন চরাতেও পার্‌ব না, তা' ব'লে রাখ্‌ছি।"

অগত্যা গিন্নীর রায়েই রায় দিতে হইল। শিবনাথ তখনও এত দুর্ব্বল যে তাহার আর ওজর-আপত্তি করিবার শক্তি ছিল না।

হাজারিবাগের হাওয়ার গুণেই হউক, অথবা অপর কোন গূঢ় কারণেই হউক, এখানে আসিয়া অবধি শিবনাথের স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হইতে লাগিল। কিন্তু স্বাস্থ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে একটা নূতন ব্যাধি অতর্কিতভাবে দেখা দিল। শরীর দুর্ব্বল থাকিলে মনও দুর্ব্বল হয়।

সেইজন্যই হউক অথবা আরোগ্যলাভের সময় মনের এমন একটা প্রসন্নতা ও সরলতা আসে যে, তখন সকল জিনিশেই একটা নূতন সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায় এইজন্যই হউক, অথবা প্রজাপতির নির্ব্বন্ধেই হউক, মতিলালের একটী অবিবাহিতা চতুর্দ্দশবর্ষীয়া শ্যালিকাকে দেখিয়া প্রৌঢ় শিবনাথের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। শ্যালক-প্রবর একটু সাহেবী মেজাজের, তাই এতদিন ভগিনীকে অবিবাহিতা রাখিয়াছিলেন, অর্থের অভাবে নহে। প্রথম প্রথম ঈষদ্‌ভিন্ন-যৌবনা কমলা অপরিচিত শিবনাথের কাছে ঘেঁষিত না। কিন্তু শিবনাথ বাটীর সকলের সহিতই এমন আত্মীয়তা-সূত্রে বদ্ধ, আর শরীরের অবস্থার জন্য সকলেরই এমন করুণার পাত্র যে, তাঁহার নিকট লজ্জা করা কমলার বেশীদিন চলিল না, পরিবেষণ-প্রভৃতির সময়ে শিবনাথের সম্মুখে বাহির হইতে হইত। এইরূপে ক্রমে তাহার লজ্জাসঙ্কোচ অনেকটা ঘুচিল, যেটুকু থাকিল সেটুকু বড় মধুর। শিবনাথ শুধু যে নয়নে সেই কিশোরী-মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন তাহা নহে, তাহার এক আধটি কথাও শ্রুতিসুখ জন্মাইল; শিবনাথের শুষ্ক হৃদয় সরস হইল।

এ সব জিনিব চট্ করিয়া স্ত্রীলোকদিগের চোখে পড়ে।

মতিলালের স্ত্রী ও শালাজ শীঘ্রই ব্যাপারটা বুঝিলেন। জাতিকুলেও অমিল ছিল না, সুতরাং মতিলালের স্ত্রী ঘটকী হইয়া মতিলালের কাণে কথাটা তুলিলেন, মতিলাল শিবনাথের মন বুঝিবার ভার লইলেন। শিবনাথ মৃদু আপত্তির পর বাল্যবন্ধু সোদরোপম মতিলালের প্রস্তাবে মত দিলেন। বহুদিন পূর্ব্বে দৃষ্ট নিদ্রিত শিশুর মুখ ও তাহার গর্ব্বিতা জননীর কথা দু' একবার মনে পড়িল বটে, কিন্তু সরাগ-হৃদয় এখন আর সে বাধা মানিল না। যথারীতি উদ্‌বাহ-মঙ্গল সমাধা হইল।

শিবনাথ ভাঙ্গা শরীর ও ভাঙ্গা মন যোড়া দিয়া কর্ম্ম-স্থানে ফিরিলেন। এবার অবশ্য তাঁহার স্বতন্ত্র বাসগৃহ হইল। খনির কার্য্য আবার পূর্ব্বের মত উদ্যমে-উৎসাহে চলিতে লাগিল। রত্নগর্ভা কমলাও স্বামীকে একটি কন্যারত্ন উপহার দিলেন।

আহা! এমনি সুখে যদি শিবনাথের অবশিষ্ট জীবন চলিয়া যাইত! কিন্তু—যদ্‌বিধের্মনসি স্থিতম্‌। দুইবৎসর না যাইতেই নবীনা জননী কমলা শিশু-কন্যার মায়া কাটাইয়া দুর্ভাগ্য স্বামীকে নিমিষের জন্য সুখস্বপ্ন দেখাইয়া, বৈকুণ্ঠ-ধামে চলিয়া গেলেন। বিপত্নীক (?) শিবনাথ শিশু-

কন্যাকে বুকে ধরিয়াও 'শূন্য, শূন্য, সব শূন্য' অনুভব করিলেন।

স্ত্রিয়শ্চরিত্রম্

বহুকাল রামনগরের জমিদার-বাটীর সংবাদ পাওয়া যায় নাই। একবার সেদিকে প্রত্যাবর্ত্তন করি।

পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে। পাঁচবৎসরে মানব-ভাগ্যে অনেক পরিবর্ত্তন হয়, শিবনাথের জীবনেই আমরা তাহা দেখিলাম। জমিদার-গৃহেই কি কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই?

জমিদারের প্রাসাদ পূর্ব্বেরই ন্যায় উচ্চ ও সমৃদ্ধ, লোকজন তেমনি গমগম করিতেছে কিন্তু সবই কি তেমনি আছে? একবার অন্তঃপুরে উকি দিয়া দেখি।

এ কি? এই দীনা-হীনার ন্যায় মলিনমুখী মলিনবেশা নারী—ইনিই কি ধনি-কন্যা গর্ব্বিতা মাতঙ্গী? এ কি চোখে জল, ব্যাপার কি?

ব্যাপার কি বুঝিবার জন্য অধিক বিলম্ব করিতে হইল না। ক্রোধে ঘূর্ণিতলোচনা বড় বধূ আসিয়া কর্কশকণ্ঠে বলিলেন,—"বলি ঠাকুরঝি! তোমার দস্যি ছেলের জ্বালায় কি আমরা ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করতে পা'ব না? তোমার

আদরের জাদুর জন্যে আমার সোণার বাছার কি খোয়ার হয়েছে, একবার এসে দেখ দেখি। শ্বশুর ঠাকুর তো' তোমায় একেবারে রাজকন্যে বানিয়ে রেখে গেছেন। এখন সেই বাপের কাছে আবদার করগে না। তিনি গেলেন, তোমায় আর তোমার এই ননীর পুতুলকে নিয়ে গেলেই তো পার্‌তেন; আমাদের জন্যে এ সুখ-শেল রেখে গেলেন কেন? ওমা যা'ব কোথা একটু কথার ঘা সয় না! কিছু বলিনি, একেবারে ঝাঝরা চোখে আর জল ধরে না যে! আবার ননীগোপালটিও যে কেঁদে আকুল। আপনি মেরে আবার কান্না! কি ছেলের কল্লা! ও কি কথা ক'ওনা যে! একেবারে বাক্যি হ'রে নিয়েছে! বাক্যি-যন্ত্রণা দিয়ে ঠাকুরজামাইকে বাড়ীছাড়া করেছ, এবার ভাই-ভাজদের তাড়াও না গো।"

মাতঙ্গী এই বাক্যের স্রোতে কিছুমাত্র বাধা দিলেন না, নিজেই ভাসিয়ে গেলেন, পুত্রকে বুকে চাপিয়া চাপা কান্নায় ফুলিতে লাগিলেন। একহাতে তালি বাজে না। বড় বউ ঝগড়ার সুবিধা না পাইয়া রাগে গরগর করিতে করিতে ও আপন মনে গজগজ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

বড় বউ চলিয়া গেলে ছেলে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—

"মা, সত্যি তুইই কি বাবাকে তাড়িয়েছিস্? মা, এত বকুনি কেন সইবি? চল্ না বাবার কাছে চ'লে যাই। বাবা আমাকে কত ভালবাসেন, বছর বছর কত খেল্না কত খাবার পাঠিয়ে দেন।"

ছেলের কথা শুনিয়া মা আরও কাঁদিয়া উঠিলেন। কষ্টে বলিলেন,—"বাছা, সে পথ যে আমি নিজেই খুইয়েছি।" মনে মনে ভাবিলেন, "হায়, তখন কি জান্তাম যে বাবা না থেকে আমার এমন খোয়ার হ'বে। কথায় বলে,—

বাপ রাজা তো, রাজার ঝী
ভাই রাজা তো, আমার কি?

আর এখন ওঁকে পাবই বা কোথা? কোথায় থাকেন কিছুই জানিনে, তাঁর মনে ব্যথা দিয়েছি, দেবতা স্বামীর অপমান করেছি, তাই তো এই দশা। এখন কি করি? আত্মঘাতী হয়ে সব জ্বালা জুড়ুতে পারি, কিন্তু দুধের বাছাকে কা'র হাতে দিয়ে যা'ব? আমি থাকৃতে এই, আমি ম'লে তো দজ্জাল বৌ ছেলেটাকে আস্ত রাখ্বে না। আহা, তাঁর হাতে যদি সঁপে দিতে পার্তাম, তা'হ'লে সুখে মর্তে পার্তাম। সুখে? না, মরণেও তো আমার সুখ

হ'বে না—যতক্ষণ তিনি আমার অপরাধ ক্ষমা না কর্‌বেন। হায়! অহঙ্কারে কি অপমানটাই তাঁকে করিছি! তিনি কি কখনও এই পাপিষ্ঠাকে মাপ কর্‌বেন? আর কি কখনও দেখা হ'বে?'

অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া একটু সুস্থ একটু শান্ত হইয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া মাতঙ্গী স্বামীকে তাঁহার পৈত্রিক ভিটার ঠিকানায় একখানি চিঠি লিখিলেন। যে পৈত্রিক ভিটা লইয়া তিনি একদিন দরিদ্র স্বামীকে টিটকারী দিয়াছিলেন, সেইখানেই এখন শরণ লইতে তিনি প্রস্তুত! কিন্তু স্বামী তো নিরুদ্দেশ, চিঠি তিনি পাইবেন কি?

প্রথম প্রথম শিবনাথ পৈত্রিক ভিটার ও তথাকার জ্ঞাতিদিগের কোনও খোঁজ লইতেন না, কিন্তু দুই বৎসর পূর্ব্বে নূতন বিবাহ-উপলক্ষে তিনি সাদরে সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং নিজের অবস্থা-পরিবর্ত্তনের কথাও জানাইয়াছিলেন। জ্ঞাতিরা আনন্দে পাকস্পর্শ-উপলক্ষে এসেনসোলে গিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ তাঁহার নিকট অর্থসাহায্যও চাহিয়াছিলেন। সেই অবধি শিবনাথের তাঁহাদিগের সহিত চিঠিপত্র চলিত। সুতরাং মাতঙ্গীর চিঠিখানি মাঠে মারা গেল না, একজন জ্ঞাতি ঠিকানা

পরিবর্ত্তন করিয়া এসেনসোলে পাঠাইলেন। শিবনাথ একে প্রিয়তমা পত্নীর শোকে বিকলচিত্ত, তাহার উপর অনেক দিন পরে এই ব্যাপারে স্তম্ভিত হইলেন। পত্রে মাতঙ্গী অনেক দুঃখের কথাই লিখিয়াছে, নিজের অপরাধের জন্য বার বার ক্ষমা চাহিয়াছে, আরও সে কত কি লিখিয়াছে, তাহার আর কি বলিব?

শিবনাথ কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া মতিলালকে সব কথা জানাইলেন। মতিলাল আবার গৃহিণীর কাছে সব কথা খুলিয়া বলিলেন। কর্ত্তা-গিন্নীতে অনেকক্ষণ ধরিয়া এ বিষয়ে পরামর্শ হইল। তাহার পর মতিলাল শিবনাথকে বুঝাইলেন,—"বৌ-ঠাকুরাণী এখন যদি এত নরম হয়েছেন, তখন এখানে আনাই উচিত। আর তোমার কচি মেয়েটারও একটা দেখ্‌বার লোক হয়।" শিবনাথ বলিলেন,—"অবস্থার পরিবর্ত্তনে তিনি এখন নরম হয়েছেন বটে, কিন্তু আমি আবার বিয়ে করেছিলাম, সতীনের মেয়ে তাঁর ঘাড়ে পড়্‌বে, এ সব কথা জান্‌লে তিনি এতটা নরম থাক্‌বেন কি? এখানে এসে সব দেখে' শুনে হয় তো একটা কেলেঙ্কারি ক'রে চলে যাবেন।" মতিলাল বুঝাইলেন,—"না দাদা তুমি বুঝ্‌ছ না, এখন তিনি যে রকম

নরম হয়েছেন, এতে আপত্তি কর্‌বেন না। আর সতীন তো আর বেঁচে নেই, সুতরাং তাঁর প্রধান ভয়টাই গেছে। আর কচি খুকীটিকে দেখে' অবিশ্যিই তাঁর দয়ামায়া হ'বে।" এই বলিয়া মতিলাল একটু হাল্‌কাসুরে বলিলেন,—"এখন দাদা দুর্গা ব'লে বেরিয়ে পড়।" শিবনাথ অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন,—"না ভাই, আমার মনের যে অবস্থা তা'তে আমার সেখানে যাওয়া অসম্ভব। এতদিন পরে সেখানে যেতে বড় বাধ-বাধ ঠেকে। বিশেষ শ্বশুর মশায় জীবিত নেই, শালা-বাবুরা কি রকম ব্যবহার কর্‌বেন, কে জানে?"

মতিলাল আবার গৃহিণীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া পরদিন শিবনাথকে বলিলেন,—"আচ্ছা দাদা, তুমি সব কথা খুলে' ব'লে বেশ ক'রে একখানা চিঠি লিখে দাও। আমিই ঝী সঙ্গে ক'রে গিয়ে বৌ-ঠাক্‌রুণকে নিয়ে আস্‌ছি।" শিবনাথ অনেক ভাবিয়া সেই কথাতেই সায় দিলেন।

কয়েকদিন পরে মতিলাল ঝীকে সঙ্গে লইয়া রামনগরে গেলেন। মাতঙ্গী পত্রে ও ঝীর মুখে সবই জানিলেন, কিন্তু সব জানিয়াও যাইতে আপত্তি করিলেন না, বরং আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। শালা-বাবুরা মতিলালের মুখে শিবনাথের ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিয়া তাঁহাকে খুব খাতির

করিলেন এবং ভগিনীকে পাঠাইতেও সম্মত হইলেন—এখন আপদ্ বিদায় হইলেই তাঁহারা বাচেন।

পরদিন মাতঙ্গী সপুত্র রওয়ানা হইলেন ও যথাসময়ে এসেনসোলে পৌছিলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়াই মাতঙ্গী গলায় বস্ত্র দিয়া স্বামীর পা জড়াইয়া ধরিলেন ও চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে বলিলেন,—"আমি বড় পাপ করেছি, তুমি যতক্ষণ মাপ না কর্ব্বে ততক্ষণ পা ছাড়্ব না।" শিবনাথ সজলনয়নে তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। তখন মাতঙ্গী চক্ষুঃ মুছিয়া মাতৃহীন শিশুটিকে বুকে তুলিয়া লইলেন, আর শিবনাথ কতকাল পরে স্নেহের সুকুমারকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন।

উমা

পূজার গল্প

“পুরবাসী বলে উমার মা,
তোর হারা তারা এলো ওই,
শুনে পাগলিনীর প্রায়,
অমনি রাণী ধায়, কই উমা বলি কই।
কেঁদে রাণী বলে,
একবার আয় মা, একবার আয় মা,
একবার আয় মা করি কোলে।”

এই ঘোর কলিকালে লোকের দেবদেবীতে বিশ্বাস ও ভক্তি শিথিল হইয়াছে, বিপদে পড়িলে লোকে আর তেমন একাগ্রচিত্তে, তেমন আকুলকণ্ঠে, দেবতাকে ডাকিতে পারে না; তাই মানুষের ডাকে আর দেবতার আসন টলে না, নহিলে ডাকের মত ডাক দিতে পারিলে কি ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে তাঁহারা এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করেন? কিন্তু আমরা

যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে দেবতা ও মানবে অন্তরঙ্গভাব ছিল, বিপদে পড়িলে ভক্ত দেবতার শরণ লইত, দেবতারাও মানবের বিপদ্ভঞ্জন করিতে কালবিলম্ব করিতেন না।

সেই সোণার সত্যযুগে একগ্রামে এক ব্রাহ্মণ-দম্পতী বাস করিতেন। ব্রাহ্মণের নাম শৈলেশ্বর, ব্রাহ্মণীর নাম গিরিরাণী। ব্রাহ্মণ ধার্ম্মিক ও সচ্চরিত্র, বিদ্বান্ ও অমায়িক-প্রকৃতি ছিলেন; ব্রাহ্মণীও সর্ব্বাংশে তাঁহার যোগ্যা ছিলেন। তাঁহার মধুর স্বভাবের গুণে ব্রাহ্মণ দারিদ্র্যের মধ্যেও শান্তিতে কালযাপন করিতেন। কেবল একটি বিষয়ে তাঁহাদিগের ক্ষোভ ছিল, তাঁহাদিগের কোন সন্তান সন্ততি ছিল না। যাহা হউক, এই ভাবে বহু বৎসর অতিবাহিত হইলে তাঁহাদিগের সে ক্ষোভও থাকিল না; ব্রাহ্মণী অধিক বয়সে এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সুলক্ষণা কন্যা প্রসব করিলেন। দেবী-ভক্ত ব্রাহ্মণ আদর করিয়া কন্যার নাম রাখিলেন 'উমা'।

উমা দিন দিন শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। মাতাপিতা তাহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহে ও আদরে লালন পালন করিতে লাগিলেন। উমা রূপে-গুণে শুধু মাতাপিতার কেন, পল্লীস্থ আবালবৃদ্ধ-বনিতার আনন্দ-

দায়িনী হইল। সকলেই বলিত, সাক্ষাৎ নগেন্দ্রনন্দিনী নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের ভক্তিতে প্রসন্না হইয়া তাঁহার কন্যারূপে অবতীর্ণা হইয়াছেন।

ক্রমে উমা বিবাহযোগ্যবয়সে উপনীতা হইল; ব্রাহ্মণ কন্যাকে সৎপাত্রস্থা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী উভয়েরই ইচ্ছা এমন সুরূপা সুশীলা সুলক্ষণা কন্যাকে কোন বিদ্বান্ রূপবান্ সচ্চরিত্র এবং ধনশালী বরের হস্তে সম্প্রদান করেন। কিন্তু দরিদ্র ব্রাহ্মণের এমন কি সহায়-সঙ্গতি আছে যে এই উচ্চ আশা চরিতার্থ করিতে পারেন? 'উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ।' ব্রাহ্মণ কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য সর্ব্বদাই বিপদ্-বারিণী শ্রীদুর্গার স্মরণ করিতেন।

জগজ্জননীর যোগাযোগে একদিন এক পরমসুন্দর পূতচরিত্র ব্রাহ্মণ রাজকুমার ছদ্মবেশে দেশভ্রমণ করিতে করিতে এই গ্রামে উপনীত হইলেন এবং মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হইলেন। ব্রাহ্মণ সে সময়ে গ্রামান্তরে গিয়াছিলেন, সুতরাং অতিথি-সৎকারের ভার উমার উপর পড়িল। কিয়ৎক্ষণ পরে ব্রাহ্মণও গৃহে ফিরিলেন। আতিথেয়তা-পরিতৃপ্ত রাজকুমার উমার রূপ-গুণে মুগ্ধ হইয়া

ব্রাহ্মণের নিকটে আত্মপরিচয় দিয়া সলজ্জভাবে উমাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন এবং ব্রাহ্মণ সম্মত হইলে পিতার অনুমতি পাইতে বাধা ঘটিবে না, একথাও বলিলেন। ব্রাহ্মণ আশার অধিক আনন্দ পাইয়া তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন; রাজকুমার স্বদেশে ফিরিয়া মিত্রদিগের দ্বারা মাতাপিতাকে সমস্ত কথা জানাইলেন। রাজা বিশ্বস্ত লোকদ্বারা কন্যা ও কন্যার পিতার তত্ত্ব লইয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং হৃষ্টচিত্তে বিবাহের উদ্‌যোগ করিলেন।

মহাসমারোহে শুভক্ষণে রাজকুমারের সঙ্গে উমার শুভ-বিবাহ হইল। উমা সাশ্রুনয়নে পতির সহিত শ্বশুরালয় যাত্রা করিল। ব্রাহ্মণী একমাত্র সন্তানের বিরহাশঙ্কায় মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে কন্যাকে আরও ব্যাকুল করিয়া তুলিলেন। ব্রাহ্মণ রাজার সাদর-নিমন্ত্রণে কন্যা-জামাতার সহিত রাজভবনে গমন করিলেন। বিবাহের আনুষঙ্গিক পাক-স্পর্শ-প্রভৃতি ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইলে ব্রাহ্মণ যখন কন্যাকে নিজালয়ে আনিবার জন্য রাজার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, তখন কিন্তু এক বিষম ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। রাজা বলিলেন, "রাজ-সংসারের নিয়ম এই যে, রাজ-বধূ কখন রাজপুরী ছাড়িয়া পিত্রালয় বা অন্যত্র যাইবে না।" এই

কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। যাহা হউক, আরও কয়েক দিন কন্যার মায়ায় রাজ-ভবনে কাটাইয়া ব্রাহ্মণ বিষণ্ণমনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ব্রাহ্মণীর অবস্থা সহজেই অনুমেয়। নবোঢ়া দুহিতা শ্বশুরালয় হইতে শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে, এই আশায় তিনি এ কয় দিন বুক বাঁধিয়া ছিলেন। এক্ষণে স্বামীর মুখে নিদারুণ বার্ত্তা শুনিয়া তিনি কন্যাবিরহ-যন্ত্রণায় শয্যা লইলেন। ব্রাহ্মণ দৃঢ়সংযমের গুণে কোন প্রকারে ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিলেন; কিন্তু পত্নীর অবস্থা দেখিয়া তাঁহার সেই ধৈর্য্যের বন্ধন ছিন্ন হইল। উভয়েই কন্যার জন্য উন্মত্তপ্রায় হইলেন, দিবানিশি শয়নে স্বপনে জাগরণে কেবল 'উমা, উমা' বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর এই আকুল ক্রন্দনে ভগবতী কৈলাসেশ্বরী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি নারদকে স্মরণ করিলেন এবং নারদ আসিলে তাঁহা দ্বারা ব্রাহ্মণকে বলিয়া পাঠাইলেন, "দেবীর আজ্ঞা, তুমি এ বৎসর দুর্গোৎসব কর এবং তদুপলক্ষে বৈবাহিককে নিমন্ত্রণ করিয়া কন্যা-জামাতা পাঠাইতে অনুরোধ কর, তাহা হইলেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। অর্থাভাবের জন্য ইতস্ততঃ

করিও না, তোমার যথাশক্তি যে আয়োজন করিবে, তাহাতেই দেবী প্রসন্না হইবেন।" ব্রাহ্মণকে এই আদেশ জানাইয়া, নারদকে আরও কি কি করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে দেবী তাঁহাকে উপদেশ দিলেন। তদনুসারে নারদ মর্ত্ত্য-লোকে অবতরণ করিয়া ব্রাহ্মণকে দেবীর আদেশ জানাইলেন এবং রাজাকে নিমন্ত্রণ করিবার ভারও গ্রহণ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে নারদ ব্রাহ্মণের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং ব্রাহ্মণের হস্তে বহু ধন দিয়া বলিলেন, 'রাজা আপনার নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন এবং পুত্র-পুত্রবধূকে ৺পূজা-উপলক্ষে এই বাটীতে পাঠাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন, পরন্তু ৺পূজার ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য আপনাকে এই অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন।' এই বলিয়া নারদ প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণ মহা-আনন্দে ও উৎসাহে দেবী-পূজার উদ্‌যোগ-আয়োজন করিতে লাগিলেন। নানাবিধ দ্রব্য-সম্ভারে ভাণ্ডার পূর্ণ হইল।

ক্রমে বোধনের দিন আসিল। পুরোহিত সায়ম্ আমন্ত্রণাধিবাসের উদ্‌যোগ করিতেছেন, যেমনি কাঁসর-ঘণ্টা বাদিত হইল, অমনি শিবিকা-বাহকগণের কোলাহল শ্রুত হইল, পরক্ষণেই ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী এবং অন্যান্য উপস্থিত স্ত্রী-

পুরুষগণ দেখিলেন, নানা বস্ত্রালঙ্কার-ভূষিতা অলক্তরাগ-রঞ্জিতচরণা উমা রাজরাজেশ্বরী-মূর্ত্তিতে স্বামিসহ প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মানা। উমা মাতা পিতার পদধূলি-গ্রহণান্তে উপস্থিত সকলকে যথাযোগ্য প্রণাম-অভিবাদন ইত্যাদি করিলেন। উমার মুখচন্দ্র-দর্শনে মাতাপিতা সুখের সাগরে ভাসিলেন এবং আশা পূর্ণ হওয়াতে গদ্গদকণ্ঠে গললগ্নীকৃতবাসে দেবীপদে প্রণাম করিয়া আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

উমা সানন্দে স্বহস্তে পাকশালার ভার লইলেন; সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী-পূজার তিন দিন অক্লান্ত পরিশ্রমে ও অদম্য উৎসাহে স্বয়ং ভোজ্যদ্রব্যাদি পাক করিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ ও অতিথি-অভ্যাগতগণকে পরিতোষ-পূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। সকলে একবাক্যে তাঁহার রন্ধনের ভূয়সী প্রশংসা করিল। সকলেই বলিতে লাগিল, যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা দীন ব্রাহ্মণের গৃহে সশরীরে অবতীর্ণা।

পূজা-অন্তে বিজয়া-দশমী। উমা সাশ্রুনয়নে মাতা-পিতাকে জানাইলেন, সেই দিনই তাঁহাকে স্বামিসহ শ্বশুরালয়-যাত্রা করিতে হইবে, রাজার এই আদেশ। দেবীর কৃপায় তিন দিন জনক-জননী প্রাণের উমার মুখশশী নিরীক্ষণ করিবার সৌভাগ্য-লাভ করিয়াছেন, ইহাতেই

তাঁহারা কৃতার্থ, সুতরাং কোন প্রকারে 'নয়নের বারি নয়নে নিবারি' তাঁহারা বিজয়াদশমী-কৃত্য সমাধা হইলে হিমালয়-নন্দিনী উমার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণকন্যা উমাকেও 'আবার আসিস্ মা' বলিয়া বিদায় দিলেন।

পরদিন ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে বলিলেন, 'পূজার কয়দিন রন্ধন-পরিবেষণাদিতে ব্যস্ত থাকায় উমার আমার ভাল করিয়া আহার হয় নাই; অতএব উদ্বৃত্ত দ্রব্যাদি হইতে উপযুক্ত পরিমাণ মিষ্টান্ন লইয়া তুমি উমার শ্বশুরালয়ে গমন কর।' সেই পরামর্শ-অনুসারে ব্রাহ্মণ মিষ্টান্ন লইয়া রাজভবনে গেলেন। রাজা বৈবাহিককে পরম-সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং কুশলাদি-প্রশ্নের পর আগমন-প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ দেবীর পূজা-উপলক্ষে রাজপ্রদত্ত অর্থসাহায্যের জন্য এবং স্বামিসহ উমাকে পিত্রালয়ে প্রেরণের জন্য রাজার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন এবং উমা একপ্রকার অভুক্ত অবস্থায়ই শ্বশুরালয়ে প্রত্যাগমন করিয়াছিল, তজ্জন্য মিষ্টান্নাদি আনিয়াছেন, ইহাও বলিলেন। রাজা সমস্ত শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তৎসম্বন্ধে তিনি কিছুই অবগত নহেন বলিলেন। তিনি রহস্যোদ্ভেদের জন্য রাজকুমারকে তথায়

ডাকাইলেন, রাজকুমার সমস্ত শুনিয়া অবাক্ হইলেন। তাঁহাদিগের সন্দেহ হইল, ব্রাহ্মণ কন্যাবিরহে বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ পুনঃপুনঃ তাঁহাদিগের কথায় প্রতিবাদ করিয়া কাতরভাবে বলিলেন, 'আচ্ছা, আমার কন্যার সহিত একবার সাক্ষাৎকার হইলেই এ কথার শেষ মীমাংসা হয়।' কিন্তু ব্রাহ্মণ কন্যার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলে কন্যাও অতিমাত্র বিস্মিতা হইল এবং পিতার উন্মাদদশায় মর্ম্মাহতা হইল। ব্রাহ্মণ তখন সংশয়ান্দোলিতচিত্তে ঈষদুচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "তবে কি আমি সত্যসত্যই উন্মাদগ্রস্ত হইলাম? আমি কি এতই ভ্রান্ত? সে সমস্তই কি স্বপ্ন? কে তবে উমারূপে দেবীপূজার কয়দিন আমার কুটির আলো করিয়াছিল?"

তখন সহসা সেই প্রকোষ্ঠ দিব্যজ্যোতিঃতে সমুদ্ভাসিত এবং পদ্মগন্ধে আমোদিত হইল। সকলে বিস্মিতলোচন দেখিলেন—রাজরাজেশ্বরী-মূর্ত্তিতে আর এক উমা তথায় আবির্ভূতা হইয়াছেন। সকলে সবিস্ময়ে শুনিলেন, তিনি মধুরহাস্য-সহকারে সকরুণকণ্ঠে বলিতেছেন, "বাবা, তুমি কন্যাবিরহকাতর হইয়া অনুক্ষণ 'উমা, উমা' বলিয়া ক্রন্দন করিতে, আমি সে ডাকে স্থির থাকিতে না পারিয়া কৈলাস-

ধাম ত্যাগ করিয়া দেবাদিদেব মহাদেবের সঙ্গে মর্ত্তো পূজাগ্রহণের ব্যপদেশে পূজার কয়দিন তোমার ভবনে অবতীর্ণা হইয়াছিলাম। আরও আমি তোমার নিকট প্রতিশ্রুত রহিলাম, প্রতিবৎসরই আমি ঐ সময়ে ঐরূপে তোমার গৃহে আসিব।” এই বলিয়া ভক্তবৎসলা জগন্মাতা অন্তর্হিতা হইলেন।

“নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা॥” *

* গল্পটি ৺কাশীধামের প্রসিদ্ধ কথক ৺ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় চূড়ামণির মুখে শুনিয়াছিলাম। ৺কাশীধামে প্রবাসকালে তাঁহার কথকতা-শ্রবণে বড়ই আনন্দ পাইতাম। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল কথক মহাশয়ের ৺কাশীপ্রাপ্তি হইয়াছে।

লক্ষ্মী

(সত্য ঘটনা-অবলম্বনে লিখিত)

(১)

গুণময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন, শিক্ষাদীক্ষায় সভ্যতায় ভব্যতায়, চরিত্রের পবিত্রতায় আদর্শ যুবক। কিন্তু আজ তাঁহার আচরণে তাঁহার শ্বশুরবাড়ীর সকলেই মর্ম্মাহত; দুই বৎসর হইল বিজয় বাবুর একমাত্র কন্যা মনোরমার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। মনোরমা এখন চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া, সে ইহার মধ্যে কয়েকবার শ্বশুরঘর করিয়াছে। গুণময়ও শনিবারে শনিবারে শ্বশুরালয়ে আসিতেন। উভয় গৃহই কলিকাতায়, সুতরাং কোন পক্ষেই অসুবিধা নাই। বেশ আনন্দে দু'জনের দিন কাটিতেছিল। কিন্তু দৈবক্রমে আজ রাত্রে গুণময় শ্বশুরমন্দিরে আসিয়া একজন ঝির মুখে কথায় কথায় শুনিয়াছেন যে বিজয় বাবুর একটি রক্ষিতা আছে, তাহাকে তিনি বিস্তর টাকা খরচ করিয়া প্রকাণ্ড বাড়ী করিয়া দিয়াছেন, ও তাহার উপর মোটা

টাকা মাসহারা দেন। যত কাযই থাকুক না কেন, নিজ বাটীতে যত বিপদ্‌ই ঘটুক না কেন, বৃষ্টি-বাদলা ঝড়-ঝাপটা যতই হউক না কেন, রোজ একটিবার করিয়া সেখানে না গেলে তাঁহার চলে না। তবে যে কারণেই হউক, সেখানে রাত্রি কাটান না। প্রবীণ শ্বশুর মহাশয়ের এই কীর্ত্তির কথা শুনিয়া চরিত্রবান্ জামাতার মন ঘৃণায় লজ্জায় রাগে ক্ষোভে পূর্ণ হইল। তিনি কোট ধরিলেন, এখনই মনোরমাকে নিজগৃহে লইয়া যাইবেন, আর কখনও তাহাকে বাপের-বাড়ীমুখো হইতে দিবেন না। এমন বাপের বাতাস লাগিলেও মনোরমার চরিত্র কলুষিত হইয়া যাইবে, গুণময়ের এইরূপ বিশ্বাস। তিনি স্পষ্টাস্পষ্টি এই কথা স্ত্রী ও শাশুড়ীকে বলিলেন এবং শাশুড়ী ঠাকুরাণী যে ঘরণী গৃহিণী হইয়াও স্বামীর এমন অনাসৃষ্টি অনাচার সহ্য করেন, সে জন্যও তাঁহাকে দু'কথা বলিতে ছাড়িলেন না। ভাগ্যে বিজয় বাবু তখন গৃহে ছিলেন না, নতুবা উচ্চশিক্ষিত জামাতা তাঁহাকেও খাতির করিতেন না। শাশুড়ী ঠাকুরাণী দু'একবার মৃদুস্বরে জামাতাকে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাহাতে ফল হইল না দেখিয়া তিনি বেশী তর্ক করিতে গেলে আরও কেলেঙ্কারী হইবে বুঝিয়া নিরস্ত হইলেন।

গুণময় ভাড়াটিয়া গাড়ী ডাকিয়া অশ্রুমুখী মনোরমাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। মনোরমার জননী নীরবে চক্ষুঃ মুছিলেন।

বিজয় বাবু যথাসময়ে গৃহে ফিরিয়া সকল কথা শুনিলেন। শুনিয়া রাগ বা দুঃখ, অভিমান বা অপমান-জ্ঞান, কোনও-রূপ মনোভাব প্রকাশ করিলেন না, গম্ভীর-মুখে খানিক ক্ষণ গুম হইয়া থাকিলেন। পরে অফিস-ঘরে গিয়া একখানি চিঠি লিখিয়া বেয়ারাকে তখনই ডাকে দিতে বলিয়া শয্যাগৃহে প্রবেশ করিলেন।

(২)

গুণময় পরদিন প্রাতে শ্বশুর মহাশয়ের চিঠিখানি পাইলেন। পোষ্টকার্ডে সামান্য কয়টি কথা। সব চিঠিখানা নকল করিয়া দিতেই বা ক্ষতি কি?

"মঙ্গলাস্পদেষু—

বাবাজী, তোমার কার্য্যে দুঃখিত হই নাই, বরং সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ও উচ্চশিক্ষার উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছ। তবে তোমাকে একটা কথা বলিবার প্রয়োজন আছে। একবার সন্ধ্যার সময়—নং বেলিয়াঘাটা

রোডে আমার একটি বন্ধুর বাটীতে আমার সঙ্গে দেখা করিতে পারিবে কি? হয়তো আমার গৃহে আর পদার্পণ করিবে না, তাই অন্যত্র দেখা করিতে বলিতেছি। আশা করি, আমার এই শেষ অনুরোধ রক্ষা করিতে ইতস্ততঃ করিবে না। একবার একদণ্ডের জন্য আমার সংস্পর্শে আসিলে তোমার চরিত্রহানির সম্ভাবনা নাই। (Robust) দৃঢ় চরিত্রের লক্ষণই এই। আশীর্ব্বাদক শ্রীবিজয়লাল বসু।"

চিঠিখানি পড়িয়া গুণময়ের প্রথম ঝোঁক হইল, কথনই এমন শ্বশুরের সহিত বাক্যালাপ করিবেন না। কিন্তু চিঠির শেষ কথাটিতে তাঁহার আত্মাভিমান বেশ একটু স্ফীত হইল; তিনি নিজ চরিত্রবলের উপর নির্ভর করিয়া অনুরোধ রক্ষা করাই স্থির করিলেন, অধিকন্তু এই সুযোগে শ্বশুর-মহাশয়কে সুনীতির মহিমা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন, ইহাও মনে মনে স্থির করিলেন।

সন্ধ্যাকালে গুণময় পত্রে নির্দ্দিষ্ট বাটীতে পৌঁছিলে দরওয়ান তাঁহাকে দ্বিতলের একটি প্রশস্ত কক্ষে লইয়া গেল। গুণময় দেখিলেন, বিজয় বাবু শুভ্র ফরাসে তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়া আলবোলায় টান দিতেছেন, আর কেহ সেখানে উপস্থিত নাই। বিজয় বাবু জামাতাকে কাছে বসিতে

বলিলেন ও বাটীর সকলের কুশল-প্রশ্ন করিলেন। পরে একটু দম লইয়া ও জামাতাকে একটু বিশ্রামের অবকাশ দিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"তোমাকে আমার জীবনের ইতিহাস শুনাইব বলিয়া আহ্বান করিয়াছি। একটু স্থির হইয়া সবটা শুনিতে হইবে, শুনিয়া তোমার যথাকর্ত্তব্য করিবে. আমি কোন আপত্তি করিব না।" গুণময় ইঙ্গিতে সম্মতি জানাইলেন। বিজয় বাবু গম্ভীরভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন।——

"আজ আমার যে উন্নতির অবস্থা দেখিতেছ, আমার প্রথম জীবনে ইহার কিছুই ছিল না। আমি দরিদ্রের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমার শৈশবেই মাতাপিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। স্বগ্রামস্থ এক জ্ঞাতির গৃহে আশ্রয় পাইয়াছিলাম, সেখানে আদরও ছিল না, অনাদরও ছিল না। তিনি নিজের ধান্ধায় ঘুরিতেন. আমার তত্ত্বাবধান করিতেন না। নির্ভাবনায় সমবয়স্ক-দিগের সহিত মিলিয়া বাগানে বাগানে কুল পেয়ারা থাওয়া ও খেলাধূলা করাই আমার কায ছিল। নামমাত্র স্কুলে যাইতাম। কিছুদিন পরে, গ্রামের স্কুলে ভাল পড়া হয় না এই অছিলায় (কেননা প্রায় বৎসরই ক্ল্যাসে উঠিতে

পারিতাম না) কলিকাতা সহরে এক ধনী আত্মীয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। তিনি অকাতরে অন্নদান করিতেন, কিন্তু তিনিও আমার উপর দৃষ্টি রাখিলেন না। তাঁহার অর্থসাহায্যে সহরের স্কুলে পড়িতে লাগিলাম। সহুরে ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া শীঘ্রই বেশ বকিয়া গেলাম, রীতিমত বদখেয়াল শিখিলাম। হাতে অর্থ ছিল না, ধনী সহপাঠীদের লেজ ধরিয়া আমোদ-সাগরে সাঁতার দিতে লাগিলাম।

"এ সব কুৎসিত কথা তোমার কাছে বলা উচিত নহে, কিন্তু না বলিলে তুমি আমাকে ঠিক বুঝিতে পারিবে না, তাই বাধ্য হইয়া বলিতেছি। একটু ধৈর্য্য ধরিয়া তোমাকে শুনিতে হইবে, আবার এই অনুরোধ করিতেছি।

"এই বেলিয়াঘাটায় এক রাত্রে কুস্থানে ইয়ারবর্গের পাল্লায় পড়িয়া বেজায় বাড়াবাড়ি করিয়াছিলাম। পরে শুনিয়াছি, বন্ধুবর্গ যখন আমোদ-প্রমোদের পর চলিয়া গেল, তখন আমি অর্দ্ধ-অচেতন, শরীরটা রীতিমত বেএক্তার হইয়া পড়িয়াছিল। সেই অবস্থায় ঐ কুস্থানের একটি নারী (তাহার নাম থাকমণি) সেবাশুশ্রূষা করিয়া আমাকে সুস্থ করিয়াছিল। সেই অবধি আমার উপর তাহার কেমন মায়া

পড়িয়া গেল। কেন জানি না, সে আমাকে সোণার চক্ষে দেখিল। ক্রমে বন্ধুবর্গের সে বাড়ীতে আনাগোনা কমিয়া আসিল, কিন্তু আমি প্রায়ই সেখান যাইতাম আর দরিদ্র হইলেও আদর-যত্ন পাইতাম। বাবাজী, বিরক্ত হইও না, মিছামিছি তোমাকে এই লজ্জাকর কথা বলিতেছি না। মন্দর ভিতর ভালর বীজ নিহিত ছিল, সেই কথাই এখন বলিব।

"এক দিন থাক আমাকে বলিল, 'দেখ, একটা কথা বলি, রাগ করিও না। তুমি যে ইয়ারদের দলে মিশিয়া একেবারে বয়াটে হইয়া যাইতেছে, ইহার শেষ কোথায় একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? উহাদের সকলের রেস্ত আছে, স্ফূর্ত্তি করিতেছে, তোমার দশা কি হইবে?' ভূতের মুখে রাম-নামের ন্যায় তাহার মুখে এই হিতবাণী শুনিয়া আমি বোকা বনিয়া গেলাম। হাসিয়া উড়াইয়া দিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু তাহার মুখ-পানে চাহিয়া সে সাহস হইল না। অগত্যা লজ্জায় অধোবদন হইলাম। সে আরম্ভ করিল, 'দেখ, ও সব চলিবে না। উহার ঢের সময় আছে; এখন তোমার লেখাপড়ার সময়। মন দিয়া লেখাপড়া কর, মানুষ হও, দু'পয়সা আনিতে শেখ, তা'র পর স্ফূর্ত্তির সুবিধার অভাব হইবে না।' এবার আমি কথা কহিলাম। বলিলাম,

'লেখাপড়া এমন অবহেলা করিয়াছি যে এখন আর চেষ্টা করিয়া শোধরাইয়া লওয়া অসম্ভব।' সে বলিল, 'বেশ, তা' হ'লে হোমিওপ্যাথি স্কুলে পড়িয়া ডাক্তার হও। তা'তে বেশী বিদ্যেসাধ্যির তো দরকার নাই।' আমি বলিলাম, 'বই কিনিতে, মাহিনা দিতে, টাকা লাগিবে। আমি কোন মুখে আশ্রয়দাতার কাছে বলিব, এদিক্‌কার লেখাপড়া হইল না, হোমিওপ্যাথি পড়িব, খরচ দিন।' থাক বলিল, 'টাকার ভাবনা তোমাকে ভাবিতে হইবে না। যা' লাগে আমি দেব। এতে আর ন'শ পঞ্চাশ লাগিবে না। তুমি মন স্থির করিয়া পড়া আরম্ভ কর।'

"আমি তো এই প্রস্তাব শুনিয়া অবাক্। যা'হক্, তাহার কথা ঠেলিতে পারিলাম না। কেমন সুবুদ্ধি হইল, তাহার প্রস্তাবে রাজী হইলাম। ক্রমে দুই বৎসর পড়িয়া পাশ করিয়া বাহির হইলাম। যে দিন পাশের সংবাদ শুনিল, সে দিন থাক আনন্দে হরির লুঠ দিল ও আমাকে ষোড়শোপচারে আহার করাইল।

"তাহার আনন্দবেগে একটু ভাটা পড়িলে আমি সঙ্কোচের সহিত বলিলাম, 'পাশ করিয়া তো বাহির হইলাম। এখন করিব কি? এ পাশে চাকরি মেলে না। ডাক্তার-

খানা খুলিয়া বসিতে হইলেও অনেক টাকার খেলা। আর কলিকাতায় গলিতে গলিতে ডাক্তার, পসার জমাইতে কখনও পারিব কিনা সন্দেহ। তোমার পরামর্শ শুনিয়া দেখিতেছি ষাঁড়ের গোবর হইলাম।'

"সে একটু হাসিয়া বলিল, 'আগে যা হচ্ছিলে সে যে একেবারেই—, ষাঁড়ের গোবর তবু তো পদে আছে। যা'হক্, তোমাকে যখন পাশ করিতে বলিয়াছি, তখন এ কথা না ভাবিয়া রাখিয়া বলি নাই।' এই বলিয়া সে ক্যাশ-বাক্স হইতে পাঁচশত টাকার নোট বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া। বলিল, 'এই টাকায় আপাততঃ দোকান সাজাও, পরে আরও লাগে আরও দেব।' আমি তাহার পুঁজির টাকা লইতে আপত্তি করিয়া বলিলাম, 'সে কি হয়? তোমার আপদ্ বিপদ আছে, সঞ্চিত টাকা কি এমন করিয়া নষ্ট করিতে আছে?' সে এবার খুব এক চোট হাসিয়া বলিল—(সে হাসি শুনিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম), 'আমাদের টাকার ভাবনা কি, বন্ধু? তুমি আর দ্বিধা করিও না, কাযে বসিয়া যাও।' আমি একটু দম লইয়া বলিলাম, 'তাই তো, এ টাকা তোমায় কি করিয়া শোধ করিব তাই ভাবিতেছি।' সে বলিল, 'ওগো, ভাবনায় কায নাই।

যখন বড় ডাক্তার হইবে, তখন ডাকিলেই আসিবে, এই সর্ত্তে টাকাটা তোমায় দিলাম। দেখো, তখন যেন ব'লোনা, আমরা কাযের লোক, বাজে কাযে সময় নষ্ট করিতে পারি না।' আমি আবেগের সহিত গাঢ়স্বরে বলিলাম, 'সে কথা ভাবিও না, থাক। আমি যত বড়ই হই, তোমার দয়া তোমার স্নেহ কখনও ভুলিব না, তুমি না ডাকিলেও রোজ একবার করিয়া আসিব।' সে বলিল, 'আচ্ছা গো আচ্ছা, সেই কথাই থাকল। দেখা যা'বে, তুমি কেমন সত্যবাদী।'

"তা'রপর দোকান সাজাইলাম, ধড়াচূড়া বাঁধিলাম, রোগীর সন্ধানে ফিরিতে লাগিলাম। জানি না, আমার কোন্ গুণে ভগবান্ মুখ তুলিয়া চাহিলেন। দেখিতে দেখিতে পসার জমিয়া গেল, হাতযশে সকলে মুগ্ধ হইল, বড় বড় ঘরে ডাক আসিতে লাগিল, মাসে হাজার টাকা উপায় করিতে লাগিলাম।

"কিন্তু ধনগর্ব্বে আমি সেই দয়াময়ী স্নেহময়ী পতিতাকে ভুলি নাই। নিজের উচ্চপ্রাসাদ-নির্ম্মাণের আগে বেলিয়া-ঘাটার সেই খোলার বাড়ীর জমি কিনিয়া এই দেখ আমার দারিদ্র্যহারিণী থাকমণির অট্টালিকা করিয়া দিয়াছি। না,

না, আর তাহাকে, 'থাক' বলিব না, তাহা হইতেই আমার এই লক্ষ্মীশ্রী.—এখানে 'লক্ষ্মী'মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছি। অসময়ে যে আমাকে অধঃপতনের অতল হইতে উদ্ধার করিয়াছে, অকূলে কূল দিয়াছে, তাহার কাছে কি আমি অকৃতজ্ঞ হইতে পারি ? তাহারই অনুরোধ বিবাহ করিয়াছি, সংসারী হইয়াছি ; স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া সুখে জীবন কাটাই-তেছি। কিন্তু আমার সেই পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি মনে করিয়া দিনান্তে একবার তাহাকে দেখা না দিয়া থাকিতে পারি না। অন্যায় করিয়াছি কি ?"

(৮)

জামাতা বাবাজী পতিতার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতে প্রথম প্রথম একটু উসফিস করিতেছিলেন, কিন্তু শেষটা বেশ নিবিষ্টচিত্তেই বৃত্তান্তটা শুনিলেন। তাহার পর শ্বশুরের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "আপনি পিতৃতুল্য, আমি যে হঠকারিতার কায করিয়াছি, বালকের ছেলেমানুষি মনে করিয়া তাহার জন্য মাফ করুন। আর সেই দয়াবতী মহিলার কাছে আমাকে একবার লইয়া চলুন, আমি তাঁহার চরণধূলি লইয়া ধন্য হইব।"

বিজয়বাবু আনন্দের আবেগে জামাতাকে বুকে টানিয়া লইলেন এবং আবেগ একটু প্রশমিত হইলে অনুচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, 'লক্ষ্মী, একবার এদিকে এস।" 'লক্ষ্মী, বোধ হয় পাশের ঘরেই ছিল, ধীরপদবিক্ষেপে শ্বশুর-জামাতার সম্মুখীন হইল। গুণময় অবাক্ হইয়া দেখিলেন, বিধবার বেশে অর্দ্ধবয়স্কা এক নারী, চোখে, মুখে হাবভাব কিছুমাত্র নাই, মুখে ম্লান হাসি ও দৃষ্টি নত। দেখিয়া গুণময় অগ্রসর হইয়া তাহাকে প্রণাম করিতে হেঁট হইতেছিলেন, 'লক্ষ্মী' ব্যস্ত হইয়া তাঁহার হাত দুইটি ধরিয়া ফেলিল, "ছিঃ বাবা,

আমাদের মত পাপিষ্ঠাকে কি তোমার মত সচ্চরিত্র ভদ্রবংশীয় ছেলের প্রণাম করিতে আছে ? এমনিই আমাদের পাপের অন্ত নাই, আবার তোমার প্রণাম গ্রহণ করিয়া কি আরও পাপে ডুবিব ? যা'হক্, আমি তোমার বয়োজ্যেষ্ঠা, আশীর্ব্বাদ করিতেছি—বেঁচে থাক, সুখে থাক, চরিত্রধনে ধনী হও।"

তাহার পর 'লক্ষ্মী' ঘটা করিয়া উভয়কে জলযোগ করাইল, সে সব বিবরণ দিয়া আর পুঁথি বাড়াইতে চাহি না।

সরস্বতী

(সত্যঘটনা-অবলম্বনে লিখিত)

(১)

আষাঢ়ের প্রবল বর্ষণে আফিসের ফের্ত্তা ঘরমুখো হরি বাবু বড় ফাঁফরে পড়িলেন। প্রায় বারো আনা রকম পাড়ি জমাইয়াছেন, এমন সময় হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ছাতায় মাথা আট্‌কান যায় কিন্তু জুতা আট্‌কান যায় না; আজকালকার কালে ভগবানের গড়া মাথা অপেক্ষা চর্ম্মকারের গড়া জুতার দরদই বেশী, কেননা মাথা ভিজিলে সহজে মুছিয়া শুকাইয়া লওয়া যায়, কিন্তু জুতা ভিজিলে ব্যাপার সঙ্গীন হইয়া পড়ে। অথচ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের জামা-কাপড়ের বেলায় যা' কিছু বাহুল্য থাকুক, জুতার বেলায় এক প্রস্থর বেশী আর দুই প্রস্থ কপালে যোটে না। জুতা হাতে করাটাও হালফ্যাশানের ভদ্রলোকের পক্ষে যেন কেমন বেয়াড়া দেখায়। এই জুতা-সমস্যায় পড়িয়া অগত্যা

হরি বাবু একটি বাড়ীর দরজা খোলা দেখিয়া অসঙ্কোচে দরজার ভিতর গিয়া দাঁড়াইলেন। নীচে লোকজনের সমাগম নাই, কিন্তু উপরের বারাণ্ডা হইতে একজন আগন্তুকের দরজায় প্রবেশ লক্ষ্য করিল। হরি বাবুর উপরদিকে চাওয়া অভ্যাস ছিল না, সুতরাং তিনি সেটা জানিতে পারিলেন না।

একটু পরে একজন ঝি আসিয়া বলিল, "বাবু, এখানে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে কষ্ট পাবেন ? ওপরে গিয়ে বস্‌বেন আসুন।" হরি বাবু সারাদিন কলম পিষিয়া ক্লান্ত হইয়াছিলেন, কোথায় বাড়ী গিয়া গা-পা ছড়াইয়া একটু আরাম করিবেন ও শ্রান্তিহারিণী তামাকুদেবীর প্রসাদে ক্লান্তি দূর করিবেন, তা' না এই দুর্য্যোগ উপস্থিত। এমন অবস্থায় তিনি এই আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, ঝির পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপরে উঠিলেন। উপরে উঠিয়া দেখিলেন, একটি ঘরের ভিতর দিয়া আর একটি ঘরে যাইতে হয়. প্রথম ঘরটিতে বিশেষ বেশী আসবাব নাই, কিন্তু দ্বিতীয় ঘরটির সাজসজ্জা ও গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর চেহারা দেখিয়া হরি বাবু অনুমানে বুঝিলেন এ কোথায় আসিয়া পড়িয়াছেন। তিনি যেন দুই পা পিছাইয়া যাইবার ভাব দেখাইলেন। গৃহস্বামিনী

তাহা বুঝিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া বলিল, "আপনি ভদ্রলোক, কষ্ট পাচ্ছেন দেখে' ঝিকে উপরে ডেকে আন্‌তে বলেছি। আমার কোন কু-মতলব নেই। এ ঘরে আস্‌তে যদি আপত্তি থাকে, তা' বেশ ঐ ঘরেই বসুন।"

এই বলিয়া সে একখানি সুদৃশ্য ও সুপরিসর গালিচা বিছাইয়া দিল ও বলিল, "আমার গুরুদেবের ব্যবহারের জন্যে এই আসন কিনেছি, কোন দ্বিধা বোধ না ক'রে এই আসনে বসুন।" হরি বাবু একটু অপ্রস্তুতভাবে রমণীর প্রদত্ত আসনে বসিয়া পড়িলেন। রমণী তখন ভরসা পাইয়া বলিল, "আকাশের যে রকম গতিক, আপনাকে অনেকক্ষণ বস্‌তে হ'বে বোধ হ'চ্ছে। জামাটামা ছাড়ুন, ঝিকে দিয়ে মাজাঘষা পেতলের ঘটীতে জল আনিয়ে দিচ্ছি, হাত-মুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা হ'ন। আর তামাক অভ্যেস আছে কি ?" হরি বাবু শেষের কথাটায় সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়িলেন। তখন রমণী বলিল, "গুরুদেব আস্‌বেন ব'লে নতুন হুঁকো-ক'ল্‌কে কিনে রেখেছি, আপনি তাইতে তামাক সেবা করুন; ঝি সেজে দিচ্ছে। গুরুদেবের জন্যে আবার হুঁকো-ক'ল্‌কে আনালেই হবে।"

হরি বাবু নাহুঁ নাহুঁ করিয়াও শেষটা রমণীর নির্দ্দেশমত

সব কাযই করিলেন। তথন আর একটু সাহস পাইয়া রমণী বলিল, "আপনার আফিসের কাপড়চোপড় দেখ্‌ছি; সারাদিন খাটুনির পর অবিশ্যিই ক্ষিদে-তেষ্ণা পেয়েছে, যদি অনুমতি করেন, ঝিকে দিয়ে বাজার থেকে ডাব আর সন্দেশ আনিয়ে দিই, একটু জলযোগ করুন।" "মৌনং সম্মতি-লক্ষণম্" বুঝিয়া রমণী ঝিকে ডাকিয়া ভিতরের ঘরে লইয়া গিয়া পয়সা দিল ও কি কি আনিতে হইবে বলিয়া দিল। এ সব স্থানের ঝি-চাকরের এমন তরিবৎ যে বাদলাবৃষ্টি ঝড়ঝাপটা বজ্রাঘাতেও তাহারা মনিবের ফরমাশ খাটিতে অবহেলা করে না। আর ঝির জুতা ভিজিবারও ভয় নাই!

একটু পরে ঝি ফিরিল। হরি বাবু তাহার হাত হইতে সন্দেশ ও মুখকাটা ডাব লইয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা দমন করিলেন ও আর এক কিস্তি গম্ভীরভাবে তামাকুদেবীর আরাধনায় মনোনিবেশ করিলেন।

ক্রমে দুর্য্যোগের অবসান হইল। তিনিও আস্তে আস্তে উঠিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থানোদ্যত হইলেন। যাইবার সময় কেমন বাধ-বাধ ঠেকিল, রমণীকে আতিথ্যের জন্য ধন্যবাদ দেওয়া ঘটিয়া উঠিল না। রমণী তাঁহাকে উঠিতে দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজা পর্য্যন্ত গেল ও সপ্রতিভভাবে বলিল,

"তবে আসুন বাবু, দেরীর জন্যে ঘরের লোকে না জানি কত ভাবছে! আবার কবে আ—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "এই দেখুন বাবু, কেমন বদ অভ্যেস হ'য়ে গেছে, কি বলতে যাচ্ছিলাম। যাক, কিছু মনে করবেন না।" হরিবাবু হাঁ না কিছু না বলিয়া আস্তে আস্তে ঘাড় গুঁজিয়া দরজার বাহির হইয়া গেলেন।

(২)

হরিবাবু গৃহে ফিরিলে গৃহিণী একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ এত দেরি যে! বৃষ্টিতে আফিসের বা'র হ'তে পারনি বুঝি?" তিনি মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন, "বৃষ্টির জন্যে পথে আট্‌কা পড়েছিলাম।" মোটের উপর সত্য কথাই বলিলেন, কোথায়, কি বৃত্তান্ত, গৃহিণীও জিজ্ঞাসা করিলেন না, তিনিও ভাঙ্গিয়া বলিলেন না। আজ বড় ক্ষুধা নাই, একটু রাত্রি করিয়া আহারাদি করিব—এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া কাপড়চোপড় ছাড়িলেন, ও হাতমুখ ধুইয়া নূতন করিয়া ধূমপানে মন দিলেন। অমৃতে কি কখন অরুচি হয়? তাহাতে আবার এক্ষেত্রে তামাকু গৃহিণীর শ্রীহস্তের সাজা। রাত্রে আহারাদির পর গৃহকর্ম্মবিরতা গৃহিণীর সঙ্গে কিছুক্ষণ প্রেমালাপের পর নিদ্রার শরণ লইতে উন্মুখ হইলেন। কিন্তু সুনিদ্রা হইল না। থাকিয়া থাকিয়া অতিথিসেবাপরায়ণা নবপরিচিতার যত্ন-আদর ও অতিথির নিষ্ঠারক্ষার জন্য আগ্রহ, এই সব কথা মনে পড়িতে লাগিল। এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের হাবভাব-সম্বন্ধে তাঁহার যে ধারণা ছিল, ইহার চরিত্রে তাহার বিপরীত ধরণ দেখিয়া

তাঁহার হৃদয় সেই রমণীর প্রতি কেমন একটা শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল।

যাহা হউক, প্রাতে উঠিয়া যথারীতি প্রাতঃকৃত্য সারিয়া ও স্নানাহার করিয়া তিনি আফিসে গেলেন। কিন্তু সেদিন অন্যদিনের মত চাপিয়া আফিসের কায করিতে পারিলেন না, কেমন যেন অন্যমনস্ক! মনে কেবলই সেই রমণীর আদর-যত্নের কথা উঠিতে লাগিল। মোহের এই তো প্রকৃতি!

আফিসের ছুটি হইলে অন্যমনস্কভাবে চলিতে চলিতে ঠিক সেই বাড়ীর দরজায় তাঁহার গতিরোধ হইল। আজ দেবদুর্যোগ নাই, তবুও একবার সেখানে আশ্রয় লইতে মন টানিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া তিনি 'ঝী, ঝী,' বলিয়া ডাকিলেন; গলার সাড়া পাইয়া ঝী আসিল না, কিন্তু গৃহস্বামিনী বারাণ্ডায় বাহির হইয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইল ও একটু চমকিত হইয়া মৃদুমধুরস্বরে বলিল, "ওপরে আসুন, ঝি দোকানে গেছে।"

হরি বাবু এই কোমল আহ্বানে উৎসাহের সহিত শিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিলেন এবং বরাবর ভিতরের ঘরেই গেলেন। আজ আর রমণী তাঁহাকে গুরুদেবের আসন

দিল না, একখানি চেয়ারে বসিতে বলিল। আসন-গ্রহণান্তে হরি বাবু গলাটা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "কা'ল তোমার আদর-যত্নে বড় আপ্যায়িত হয়েছি, তখন ধন্যবাদ দিতে পারিনি, তাই আজ সেই ত্রুটী শোধ্‌রাতে এসেছি।" রমণী এ কথার কোন উত্তর না দিয়া একটু মৃদু হাসিয়া তাঁহাকে হাত-মুখ ধুইতে জলের ঘটী সরাইয়া দিল এবং ধূমপান ও জলযোগের ব্যবস্থা করিল; তবে আজ ঘরের তৈয়ারি খাবার—বাজারের নহে। হরি বাবু খাবার খাইতে একটু মৃদু আপত্তি করিয়া শেষে জিনিশগুলির সদ্‌ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

জলযোগান্তে গৃহস্বামিনীর তৈয়ারি তামাক টানিতে টানিতে শয্যাপার্শ্বে হারমোনিয়ামটা দেখিয়া তিনি একটু আব্দারের সুরে বলিলেন, "বাজনাটা দেখে' লোভ হচ্চে একটু গান শুনি। আমার এ অনুরোধটা না রাখ্‌লে অতিথি-সৎকারে ত্রুটি থেকে যা'বে কিন্তু।" রমণী দ্বিরুক্তি না করিয়া আবার একটু মৃদু হাসিয়া যন্ত্রে সুর দিয়া কীর্ত্তন ধরিল এবং উপরি-উপরি ৩।৪টি বিরহ গায়িয়া তাহার পর চাবিটা বন্ধ করিয়া দিল।

গানের রেশ যত ক্ষণ কাণে রহিল, তত ক্ষণ হরি বাবু

কেমন এক রকম হইয়া থাকিলেন। তাহার পর ধ্যানভঙ্গ হইলে বুঝিলেন, রমণীর অনেকটা সময় লইয়াছেন, তাঁহারও অনেক বিলম্ব হইতেছে, তিনি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। রমণী বাধা দিল না। কেবল কল্য যে কথাটা 'অদ্ধোক্তে' চাপিয়া গিয়াছিল, অদ্য সেই কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিল, "আবার কবে আস্‌বেন?" হরি বাবু জড়িতকণ্ঠে কি একটা জবাব দিলেন তাহা ভাল করিয়া শুনা গেল না।

(৩)

সেইদিন হইতে প্রায় প্রত্যহই হরিবাবু আফিসের ফেরতা এইখানে 'চিত্তবিশ্রাম' করিতে আসিতেন, দু'দণ্ড বসিতেন, দু'টা গান শুনিতেন, দু'টা মিষ্টালাপ করিতেন, (মিষ্টমুখও কোন্ না করিতেন?) ও পরে বিদায় লইতেন। ক্রমে তিনি রমণীর নাম-পরিচয় পাইলেন; নামটিও সার্থক, কেননা পতিতা সরস্বতী দেবী সরস্বতীর কৃপায় গীতবাদ্যনিপুণা, অর্থাৎ 'রূপে লক্ষ্মী' না হইলেও 'গুণে সরস্বতী'। রমণীও তাঁহার নাম-ধাম সংসারের কথা সবই জানিয়া লইল। হরি বাবু ঘরে ফিরিয়া অক্ষুধার ও বিলম্বের কি কৈফিয়ৎ দিতেন জানি না,

জানিলেও সে মিথ্যাচারের, কৈতববাদের পরিচয় দিতে চাহি না। গৃহিণী আম্‌তা আম্‌তা উত্তর শুনিয়া আকারে-ইঙ্গিতে ব্যাপার বুঝিয়াও, ইহা লইয়া আর খোঁচাখুঁচি করিতেন না, স্বভাব-সুলভ গাম্ভীর্য্য ও ধীরতার সহিত সহ্য করিয়া যাইতেন।

এইভাবে অনেকদিন সারস্বতকুঞ্জে সুখ-সম্মিলন চলিল। কতদিন কে জানে? 'বৎসরেই কি কালের পরিমাণ হয়?'

তাহার পর একদিন আকাশে মেঘ দেখা দিল, দুর্দ্দিন পড়িল। হরি বাবু পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইলেন, আফিস যাওয়া বন্ধ হইল, সুতরাং আফিসের ফেরতা গান শোনার পাঠও বন্ধ হইল। কয়েকদিন অদর্শনে সরস্বতী বিমনাঃ হইয়া উঠিল; ঠিকানা জানা ছিল, সে আর থাকিতে না পারিয়া কৌশলে সংবাদ-সংগ্রহের জন্য ঝীকে হরি বাবুদের পাড়ায় পাঠাইল। ঝী আসিয়া যে সংবাদ দিল তাহাতে সে বসিয়া পড়িল। যা' হ'ক্‌, কতকটা সামলাইয়া লইয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া শেষে সে নিজেই রোগীর উদ্দেশে যাত্রা করিল। গৃহিণী অপরিচিতা নারীকে শুষ্কমুখে ও ব্যাকুলকণ্ঠে স্বামীর পীড়া-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে শুনিয়া একটু বিস্মিত হইলেন,

হয়তো একটু সন্দেহও করিলেন। কিন্তু যে কালের ছায়া তখন পড়িয়াছে, তাহাতে আর বিস্ময়-বিদ্বেষের বিশেষ অবসর ছিল না, তিনি কোন প্রশ্ন না করিয়া রমণীর প্রার্থনামত তাহাকে স্বামীর রোগশয্যাপার্শ্বে লইয়া গেলেন।

হরি বাবু তখন বাক্‌শক্তি হারাইয়াছেন, কিন্তু সরস্বতীকে কাছে পাইয়া তাঁহার রোগক্লিষ্ট বিশীর্ণ বদনমণ্ডলে যে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিল ও পরক্ষণেই দুই চক্ষুঃ দিয়া যে অশ্রু-ধারা ঝরিতে লাগিল, তাহা লক্ষ্য করিয়া গৃহিণী ব্যাপারটা সবই বুঝিলেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি তখন আর গৃহিণীর বিরাগ-বিদ্বেষ-রোষ-অভিমানের সময় নহে। সরস্বতী ম্লানমুখে রোগীর শয্যাপার্শ্বে কায়েমী-ভাবে বসিল এবং সেবার ভার গ্রহণ করিল। চাপাগলায় গৃহিণীকে বলিল, "দিদি, এখন বেশী কথার সময় নয়। আমি প্রাণ-পণে এঁর সেবা কর্‌ব। এমন রুগী ফেলে' রোজ বাড়ী যাওয়া চল্‌বে না। আমাকে দু'বেলা দু'মুঠো দিও। আর যা'তে ভাল ডাক্তার দেখান হয়, তা'র ব্যবস্থা কর। টাকার জন্যে ভেবো না।"

সহরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার আনা হইল, চিকিৎসার কিছুই ত্রুটি হইল না, কিন্তু রোগীর অবস্থা ক্রমেই খারাপ

দাঁড়াইল; কেবল কণ্ঠে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল। হরি বাবু নিঃসন্তানা নিঃসহায়া গৃহিণীর পানে যখনই চাহিতেন তখনই তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া যাইত, দুই চক্ষুঃ জলে ভরিয়া যাইত, তাঁহার অবর্ত্তমানে গৃহিণীর কি দশা হইবে—শুধু ভদ্রাসন বাড়ীখানি ও প্রভিডেণ্ট্ ফণ্ডের কিছু টাকা ভরসা—এই ভাবনা তাঁহার রোগযন্ত্রণাকেও ছাপাইয়া উঠিল। সে কথা তিনি গৃহিণীকে কিছুতেই বলিতে না পারিয়া একদিন গৃহিণীর অসাক্ষাতে সরস্বতীকে বলিয়া ফেলিলেন। সে মৃদুস্বরে বলিল, "ভয় কি? আপনি সেরে উঠবেন, অত ভাব্বেন না। আর যদি মন্দটাই হয়, তবে দিদির জন্যে আপনি মন খারাপ কর্বেন না, সে ভার আমার রইল, এবিষয়ে তাঁকে কোনও কষ্ট পেতে দেব না।" তখন হইতে রোগীর মুখখানা একটু প্রসন্ন হইল, কিন্তু কালরোগে তাঁহাকে অব্যাহতি দিল না। সেই রাত্রেই পদপ্রান্তে লুণ্ঠিতা গৃহলক্ষ্মীকেও শিরোদেশে উপবিষ্টা পতিতা সরস্বতীকে কাঁদাইয়া তিনি কোন্ অজানা দেশে চলিয়া গেলেন!

(৪)

শ্রাদ্ধাদির পরে শোকের প্রথম বেগ কথঞ্চিৎ শান্ত হইলে অভাগিনী বিধবা বিধবাবেশধারিণী সরস্বতীকে বলিলেন, "বোন, আমার ইচ্ছে বাড়ীখান বেচে ও আফিসের টাকা তুলে' নিয়ে কাশীবাস করি। তুমি আর কত দিন আমার কাছে প'ড়ে থাক্‌বে?" সরস্বতী ভগ্নকণ্ঠে বলিল, "দিদি, তুমি তীর্থযাত্রা কর্‌বে, বাধা দেব না। কিন্তু এই বাড়ীই আমার মহাতীর্থ, আমি এবাড়ী ছাড়তে পার্‌ব না। দশজন পাড়ার লোক ডেকে বাড়ীর ন্যায্য দাম ঠিক কর, আমিই তোমাকে সে দাম দেব। তবে ইচ্ছে ছিল, যে ক'দিন এ পোড়াপ্রাণ থাক্‌বে, তোমার মত সতীলক্ষ্মীর সেবা ক'রে পূর্ব্বজন্মের ও এ জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ব, কিন্তু দয়াল ঠাকুর আমার কপালে তা' লেখেন নি?"

কথাটা শুনিয়া বিধবা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন। পরে বলিলেন, "বোন, তুমি যে বল্‌ছ এ বাড়ী আমাদের মহাতীর্থ, তা' বটে। আমারও ইচ্ছে করে, তাঁর চরণ স্মরণ ক'রে, এইখানেই প'ড়ে থাকি, কিন্তু আফিসের সামান্য টাকায় ত পোড়া পেটে কুলোবে না। আরও কতকাল

বাঁচতে হ'বে তা' কে জানে ? তাই বাড়ী বিক্রী করতে চাই।” সরস্বতী উত্তর করিল, “দিদি, তোমার যদি এই বাড়ীতে থাকা মত হয়, তবে সে জন্যে ভাবতে হ'বে না। আমি তা'র ব্যবস্থা করব। আমি তো তোমার আশ্রয়েই থাকব, আমার বাড়ীখানার আর দরকার কি ? সেইখানাই বেচে ফেলি। তুমি এতে অমত করো না, লক্ষ্মী দিদি, সে বাড়ী আমার পৈত্রিক—পাপের ধনের নয়। তুমি অনুমতি দাও, সেই বাড়ীবেচা টাকা সুদে খাটালে দুটো বিধবার পেট বেশ চ'লে যা'বে।”

হয় ত অন্য সময়ে হইলে বিধবা এ প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিতেন; কিন্তু আর মনের জোর নাই। তাহা ছাড়া সর্ব্বদা সরস্বতীর সংসর্গে থাকিয়া তাহার স্বভাব-চরিত্র দেখিয়া, তাহার সেবা পাইয়া, তাঁহার মনটা আর তাহার দিকে বিমুখ ছিল না। তিনি গদ্গদ্কণ্ঠে বলিলেন, “সরি, তুই আর জন্মে আমার বোন ছিলি ! তোর যা' ভাল বোধ হয় তাই কর্, আমি কোনও কথা কইব না।”

এই কথাবার্ত্তার পর সরস্বতী পাপের অর্জ্জিত সমস্ত অর্থ অনাথাশ্রমে দান করিল ও বাড়ী বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইল শুধু তাহাই সম্বল করিয়া দুই জনের জন্য

পুঁজি করিল। সে যত দিন বাঁচিয়া ছিল, বিধবার নিয়ম পালন করিয়া ও 'দিদি'র সেবা করিয়া কাটাইয়াছিল। তাহার পর একদিন হতভাগিনীর জীবন-বর্ত্তিকা নিবিল; সে 'দিদি'র চরণে মাথা রাখিয়া, তাঁহার ক্ষমাভিক্ষা করিয়া, মহাযাত্রা করিল। বিধবা সেই যুগল শ্মশান-স্মৃতি হৃদয়ে বহন করিয়া আরও কিছুদিন দারুণ মনঃকষ্টে জীবন কাটাইয়া শেষে পরলোকে পতির সহিত মিলিত হইলেন। কে জানে সেখানে লক্ষ্মী-সরস্বতীর ন্যায় উভয়েই স্বামি-নারায়ণের পদসেবার অধিকার পাইয়াছিলেন কি না?

লক্ষ্মী-সরস্বতী-সম্বন্ধে মন্তব্য

'নারায়ণে' (শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২৬) 'গণিকাতন্ত্র সাহিত্য'-শীর্ষক প্রবন্ধাবলিতে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, যে 'পতিতার মসীময় চরিত্রেও অতর্কিত ভাবে একটা শুভ্র রেখার আবির্ভাব হয়, কালো মেঘের কোলে অকস্মাৎ একটু ঝিকিমিকি করে, প্রকৃত প্রেমের প্রভাবে পতিতার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয়, ইত্যাদি ব্যাপার রোমাণ্টিক রীতির প্রভাবে সাহিত্যে প্রকটিত হইতেছে।' ইহারই সমর্থন-কল্পে বিশ্বস্তসূত্রে অবগত দুইটি প্রকৃত ঘটনা-অবলম্বনে 'লক্ষ্মী' ও 'সরস্বতী' নামে দুইটি গল্প লিখিয়াছি। এই দুইটি প্রকৃত ঘটনা হইতে বুঝা যায়, প্রবীণ লেখক শ্রীযুক্ত জলধর সেনের 'হরিশ ভাণ্ডারী' গল্পে পতিতা দুর্গার চরিত্র-সংশোধন নিতান্ত কবিকল্পনা নহে, এরূপ ব্যাপার বাস্তবজীবনেও ঘটে। এইটুকু দেখানই আমার উদ্দেশ্য। গণিকাতন্ত্র সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার গল্প-রচনার উপযুক্ত কল্পনা ও আর্ট নাই, সুতরাং এই ভোঁতা তূলিকায় অঙ্কিত লক্ষ্মী-সরস্বতী গুণীচিত্রকর জলধর বাবুর নিপুণ তূলিকায় অঙ্কিত দুর্গার পার্শ্বে স্থান পাইবে, এরূপ দুরাশা করি না।

পরিশিষ্ট

('স্বপ্নাপ্ত মাদুলি' গল্পের মূল)

JONES : CREDULITIES PAST & PRESENT.

(CH. III, *Amulets and Talismans*, *pp 191—92.*)

The Germans have a curious legend connected with this talisman. It was framed by some of the magi in the train of the ambassadors of Aaroun-al-Raschid to the mighty Emperor of the West, at the instance of his spouse Fastrada, with the virtue that her husband would be always fascinated towards the person or thing on which it was. The constant love of Charles to this his spouse was the consequence; but as it was not taken from her finger after death, the affection of the emperor was continued unchanging to the corpse, which he would on no account allow to be interred, even when it became offensive. His confessor, having some knowledge of the occult sciences, at last drew off the amulet from the

inanimate body, which was then permitted to be buried; but he retained possession of it himself, and thence became Charle'ss chief favourite and prime minister, till he had been promoted to the highest ecclesiastical dignity, as Archbishop of Mainz and Chancellor of the Empire. At this pitch of power, whether he thought he could rise no higher, or scruples of conscience were awakened by the hierarchical vows, he could hold the heathen charm no longer, and he threw it into a lake not far from his metropolitan seat, where the town of Aachen now stands. The regard and affection of the monarch were immediately diverted from the monk and all men, to the country surrounding the lake; and he determined on building there a magnificent palace for his constant residence, and robbed all the ancient and imperial residences, even to the distance of Ravenna, in Italy, to adorn it. Here he subsequently resided and died; but it seems the charm had a passive as well as an active power; his throes of death were long and violent; and though dissolution seemed every moment impend-

ing, still he lingered in ceaseless agony, until the archbishop, who was called to his bedside to administer the last sacred rites, perceiving the cause, had the lake dragged, and obtaining the talisman, he restored it to the person of the dying monarch, when his struggling soul parted quietly away. The grave was opened by Otto III. in 997, and possibly the town of Aachen may have been thought the proper depository.

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

মূল্যবান্ সংস্করণের মতই—

কাগজ, ছাপা, বাঁধাই—সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।

—আধুনিক শ্রেষ্ঠ লেখকের পুস্তকই প্রকাশিত হয়।—

বঙ্গদেশে যাহা কেহ ভাবেন নাই, আশাও করেন নাই। আমরাই ইহার প্রথম প্রবর্ত্তক। বিলাতকেও হার মানিতে হইয়াছে—সমগ্র ভারতবর্ষে ইহা নূতন সৃষ্টি। বঙ্গসাহিত্যের অধিক প্রচারের আশায় ও যাহাতে সকল শ্রেণীর ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠে সমর্থ হন, সেই মহা উদ্দেশ্যে আমরা এই অভিনব 'আট-আনা-সংস্করণ' প্রকাশ করিয়াছি।

মফঃস্বলবাসীদের সুবিধার্থ, নাম রেজেষ্ট্রী করা হয়। গ্রাহকদিগের নিকট নবপ্রকাশিত পুস্তক ভিঃ পিঃ ডাকে প্রেরিত হয়। পূর্ব্ব প্রকাশিতগুলি একত্র, বা পত্র লিখিয়া, সুবিধানুযায়ী, পৃথক্ পৃথকও লইতে পারেন।

ডাকবিভাগের নূতন নিয়মানুসারে মাশুলের হার বর্দ্ধিত হওয়ায়, গ্রাহকদিগের প্রতি পুস্তক ভিঃ পিঃ ডাকে ৶০ লাগিবে। অ-গ্রাহকদিগের ৷৴০ লাগিবে।

গ্রাহকদিগের কোন বিষয় জানিতে হইলে, "গ্রাহক-নম্বর" সহ পত্র দিতে হইবে।

প্রতি বাঙ্গালা মাসে একখানি নূতন পুস্তক প্রকাশিত হয় ;—

১। অভাগী (৬ষ্ঠ সংস্করণ)—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর।

২। ধর্ম্মপাল (৩য় সং)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ।

৩। পল্লীসমাজ (৬ষ্ঠ সং)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৪। কাঞ্চনমালা (২য় সং)—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম-এ।
৫। বিবাহ-বিপ্লব (২য় সং)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল
৬। চিত্রালী (২য় সং)—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি-এ।
৭। দুর্ব্বাদল (২য় সং)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।
৮। শাশ্বত ভিখারী (২য় সং)—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।
৯। বড়বাড়ী (৫ম সংস্করণ)—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর।
১০। অরক্ষণীয়া (৬ষ্ঠ সং)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
১১। ময়ূখ (২য় সং)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ।
১২। সত্য ও মিথ্যা (২য় সং)—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।
১৩। রূপের বালাই (২য় সং)—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।
১৪। সোণার পদ্ম (২য় সং)—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৫। লাইকা (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী।
১৬। আলেয়া (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।
১৭। বেগম সমরু (সচিত্র)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৮। নকল পাঞ্জাবী (২য় সংস্করণ)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।
১৯। বিল্বদল—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।
২০। হালদার বাড়ী—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।
২১। মধুপর্ক—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।
২২। লীলার স্বপ্ন—শ্রীমনোমোহন রায়, বি-এ।
২৩। সুখের ঘর (২য় সং)—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, এম-এ।
২৪। মধুমল্লী—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

২৫। রসির ডায়েরী—শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী।

২৬। ফুলের তোড়া—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

২৭। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

২৮। সীমন্তিনী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

২৯। নব-বিজ্ঞান—অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ।

৩০। নববর্ষের স্বপ্ন—শ্রীসরলা দেবী।

৩১। নীল মাণিক—রায় বাহাদুর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, ডি-লিট।

৩২। হিসাবনিকাশ—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল।

৩৩। মায়ের প্রসাদ—শ্রীবারেন্দ্রনাথ ঘোষ।

৩৪। ইংরেজী কাব্যকথা—শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ।

৩৫। জলছবি—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

৩৬। শয়তানের দান—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

৩৭। ব্রাহ্মণ-পরিবার—(২য় সংস্করণ) শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য।

৩৮। পথে-বিপথে—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি-আই-ই।

৩৯। হরিশ ভাণ্ডারী (৩য় সংস্করণ) রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

৪০। কোন্ পথে—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, এম-এ।

৪১। পরিণাম—শ্রীগুরুদাস সরকার, এম-এ।

৪২। পল্লীরাণী—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

৪৩। ভবানী—৺নিত্যকৃষ্ণ বসু।

৪৪। অমিয় উৎস—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৪৫। অপরিচিতা (২য় সং)—শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ।

৪৬। প্রত্যাবর্ত্তন—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বসুমতী-সম্পাদক।